ছয় ঋতু বারো মাস

ছয় ঋতু বারো মাস

মিহির আচার্য

আভেনির
২৩৮বি রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা

শান্তি আচার্য

প্রীতিভাজনীয়াসু

এই উপন্যাসের পটভূমি আঞ্চলিক। যেটুকু ইতিহাস এখানে আশ্রিত হয়েছে তা শুধু আঞ্চলিক চরিত্রকেই যথাযথ আভাসিত করবার জন্যে। কোনো স্থানের মানব-চরিত্রের মূল সূত্রগুলি বুঝতে হলে সবার আগে বুঝতে হবে সে-স্থানের প্রকৃতি আর ঐতিহ্যকে। এক হিসাবে এ-কাহিনীর পাত্রপাত্রী স্থানিক। তবু, গোষ্পদে যেমন নভোমণ্ডলের ব্যঞ্জনা সীমিত থাকে সেই অর্থে একে সর্বজনিকও বলা যেতে পারে॥

এক-একটি দিন যেন নিত্যবৃত্ত ছন্দে আবর্তিত হচ্ছে। এক-একটি ঋতুর নৃত্যের তালে তালে ঘুঙুর-পায়ে মহানন্দাও ছুটেছে—কখনো উদ্দাম, কখনো শ্রান্ত জীবনের মতো, নিস্তরঙ্গ, নিষ্প্রাণ।

ওপারে সাহাপুরের গ্রামশীর্ষে যেখানে দিগন্তে ঝোপঝাড় বুনো গাছপালায় ঘন বুনট সেখানে মাথার ওপরে গোধূলি-সূর্য, লালের অজস্র বর্ণরাগ, শীতার্ত মহানন্দার জলে তার প্রতিবিম্ব, ধারাল রক্ত-মাখা ছুরির মতো ঝিকমিক করছে।

এক-শতাব্দী আগে গড়ে-ওঠা শহরটা ঠিক তেমনি আছে। গৌড়ের পাঁজর ভেঙে ধার-করা ইটে গড়ে উঠল আংরেজাবাদ। ডাচদের কুঠি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কুঠি। নয়া শহরের বনিয়াদের তলায় গৌড়ের নিহত আত্মা নিদ্রিত রয়েছে।

মাত্র উনিশ শতকের গোড়ায় রাতারাতি গজিয়ে ওঠা উত্তর বাংলার এই ছোট্ট শহরটা আমূল চরিত্র হারিয়ে বেনে কোম্পানির গঞ্জ হয়ে উঠল। একদা বণিকের মানদণ্ড পোহালে শর্বরী রাজদণ্ডরূপে উদ্যত হল। শাসন আর শোষণের চক্রহার সুদ। তারপর মহানন্দা-কালিন্দীব সঙ্গমে বর্ষাঋতুতে যেখানে সোজাসুজি যোগ ছিল পুণ্যতোয়া গঙ্গার সঙ্গে—সেই গঙ্গা তার গতি ফেরাল। যোগ হারাল শহর। ঠানদিদির ঝুলি হাতে উঠতি শহর অকালে বুড়ী হয়ে তার রুদ্রাক্ষের মালা জপতে লাগল।

মহানন্দার দিকে চোখ ফেরালে তার অশ্রান্ত রোলের মধ্যে কি সেদিনের সে-ইতিহাস ধরা পড়ে! কিন্তু সন্ধ্যার অবগুণ্ঠনে দিগন্তেব দিকে তাকিয়ে থেকে মনটা কেন অতীতের দিকেই পিছু হাঁটতে চায়? বর্তমানটা দেউলে বলেই বোধ করি।

আজ বিশ শতকের মাঝামাঝি সেই পুরাতন দিনগুলির পাতা ওলটাতে ওলটাতে আধুনিক অধ্যায়ে এসে থমকে পড়লেও নতুনত্বের কোনো অন্তর্নিহিত [illegible]।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি নেই, তার কুঠির গায়ে একালের পলেস্তারা চাপিয়ে তাকে কালেক্টরি বানানো হয়েছে, ডাচদের কনভেণ্ট পরিণত হয়েছে সিভিল সার্জেনের রেসিডেন্সে। আর বন্যার হাত থেকে শহরকে বাঁচাবার জন্যে তৈরি হয়েছে লম্বা বাঁধ।

সেদিনও মহামারী ছিল, বহ্ন্যুৎপাত ছিল, ছিল দুর্ভিক্ষ। আর দিগ্বিদিকে প্রাণভয়ে মরীয়া মানুষের মিছিল। শাক্ত জনপদ ষোল শতকে চৈতন্যের বৈষ্ণবীয়া রসে অসি ছেড়ে বাঁশি ধরেছে। আর নীলের দাদনের টিপসইয়ে কিংবা রেশম কুঠির রূপকথার তলায় পাখোয়াজে হরিনামের মন্ত্রে মুক্তি খুঁজেছে।

আকালের দিনে সেদিনও বাপ তার সন্তানকে বেচেছে। পাদরী টমাস সাহেব আর কোম্পানির কর্মচারীরা সেই আঠারো শতকের শেষের দিকে মাত্র ছ-আনায় এক-একটি শিশু খরিদ করেছেন।

প্রাচীন ইতিহাসের ছাত্র তিমির সেই প্রাচীন ও আধুনিক ইতিহাসের অন্তর্নিহিত ভাব-সত্যকেই আবিষ্কার করতে চায়। সমাজ-সত্যটা ক্যাঙারুর মতো লাফ দিয়ে দিয়ে এগিয়ে আসে, না যন্ত্রের শেকলের প্রতিটি গিঁটকে আঁকড়ে ধরে তার ছান্দসিক যাত্রা!

উনত্রিশ বছর ধরে সমস্ত শহরটা মুখস্থ হয়ে গেছে। ভেতর থেকে যখন বন্দী ইচ্ছাটা ঠেলা দিয়েছে বাইরে, ছিটকে পড়েছে পথে। ফুলবাড়ি, কুতুবপুর, ইংরেজবাজার, মকদমপুর, অভিরামপুর চষে ফেলেছে দু-পায়ে। এ-গলি সে-গলি কত ঘুরেছে শুধু অভ্যাসের বশে। শহরের এখানে-ওখানে ফেঁপে-ওঠা সদাগরী আর সরকারী দপ্তর-আদালত—ঘোরার আর শেষ নেই।

সমস্ত দিন গেল নিরর্থক পরিক্রমায়।

এরও পর নামবে রাত্রি অশথের ঘনমূল শিকড় ছড়িয়ে। তেমনি গাঢ় গহন অন্ধকার। অন্ধকার—এই অন্ধকারের অতীত নেই, নেই ভবিষ্যত। চোখ বুজে তখন নিজেকে আবিষ্কার করা চলে।

সারাদিনের আকাশজোড়া ক্লান্তি শেষে মস্তিষ্কের কারখানাটা তুমুল কোলাহলে সোচ্চার হয়ে ওঠে। বাঁধভাঙা বন্যার মতো অনর্গল, অবিশ্রান্ত।

তবু বাসায় ফিরতে হবে। সেই একতলা ভাঙাচুরো ছাতা-পড়া বাড়ি আব তারচেয়েও পুরনো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া বাড়ির লোকগুলি। একই বৃত্ত, একই একঘেয়ে ক্লান্তক্লিষ্ট রাগিণী। অতগুলো চোখে হাজারো নক্ষত্রের জিজ্ঞাসা।

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাড়িতে ঢুকল তিমিব।

—কে যায়? বাবার ঘবের পাশ দিয়ে যেতেই বৃদ্ধ মোক্তার সাহেবেব কণ্ঠস্বব। চণ্ডীচরণ পালিত। সবচেয়ে ভয় কবে বাবার এই সপ্রশ্ন জিজ্ঞাসার ভঙ্গীটুকু। যেমন অসংকোচ তেমনি যুক্তি-তর্কাতীত। আজ উনত্রিশ বছর ধরে দেখছে ছিটের কোট-পেণ্টুলুনে মোড়া হ্রস্ব এই মানুষটিকে। মাথায় পাতলা শাদা চুলের পালিশ, তোবড়ানো গাল, কয়েকটা নড়বড়ে হলদে দাঁত ঝুলছে ঠোঁটের প্রান্তে। জীবনে কোনোদিন কোনো পবিকল্পনা ছিল না, ঢিমে তেতালায় গরুর গাড়ির সাবেকী ছন্দে জীবনকে গড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। আজ প্রায়-প্রৌঢ়ত্বের সীমায় পৌঁছে কৃতজ্ঞতাব সঙ্গে রেখে গেছেন বেসামাল অপরিমিত সন্তানদেব জঞ্জাল।

জীবন নয়, জীবনের এক প্রচণ্ড তামাশা।

—কে? চণ্ডীচবণ আবার হাঁকলেন।

—আমি। তিমিব শ্রান্তি-ভাঙা গলায় জবাব দিল।

—খোকা?

—হুঁ।

—কী হল?

মাথা নেড়ে জানাল তিমির, হল না। দেখা করেছিলাম মিস্তির সাহেবের সঙ্গে। ওই চাকরির জন্যে সাত শ দরখাস্ত পড়েছে। অর্ডিনারি গ্রাজুয়েটে চলবে না···

চণ্ডীচরণ গুম হয়ে রইলেন।

আর সবচেয়ে অস্বস্তিকর এই গুমট ভাবটাই। অদ্ভুত এই সংসার নামক আজব বস্তুটি। নৈরাজ্য আর অবিশ্বাস।

কেন এমন হয়? বুঝতে পারে না তিমির। দম বন্ধ হয়ে আসে তার। অহরহ পীড়াদায়ক এই বেদনাবোধ।

জীবন নয়, জীবনের ব্যভিচার।

অন্ধকারে নিজের মলিন বিছানার কাছে পালিয়ে আসতে পেরে যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচে। এই তক্তপোশের প্রতিটি কোণ তার চেনা, ক্লান্ত শরীরকে এলিয়ে দিলে পরম প্রিয়জনেব মতোই যেন তাকে আঁকড়ে ধরে।

একটি চাকরি চাই।

মিত্তির সাহেবের সঙ্গে ইণ্টারভিউয়ের চিত্রটা এখনো চোখের সামনে ভাসছে।

—কি পাশ আপনি?

—বি. এ.

—আপনার মতো বি. এ. দেশে ফ্যা ফ্যা কবে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

—সেটা এদেশের দুর্ভাগ্য।

—টাইপ জানেন?

—না।

—যান। যতদিন বসে আছেন টাইপটা শিখুন। চাকরি দেব।

—আচ্ছা।

কাল থেকেই টাইপ ক্লাশে ভরতি হয়ে যেতে হবে। বিশীর্ণ হাসল তিমির।

—দাদা, খাবে এস। সুলতার গলা।

উনিশ বসন্তের মেয়ে সুলতা। সংসারে ওর অস্তিত্বটুকু তিমিরের চেয়েও ভয়াবহ। সংসারের পুঞ্জীকৃত একটা বিশ্রী আক্রোশ তার

দেহ মনকে অকালে পাণ্ডুর করে তুলেছে। ওর দীর্ঘায়ত চোখের পাতায় এখনি ঘন ক্লান্তির ছায়া। মা বাপের যত গঞ্জনার শিলাবৃষ্টি সর্বসহা বসুধার মতো তাকেই বহন করতে হয়। কারখানা-বাড়ির রিফিউজ সেকশেন সে।

তিমির ছাড়া সাধারণত কেউ সহ্য করে না সুলতাকে।

দুই ভাইবোনের দুঃখের ক্ষেত্রে কোথায় একটা মিল রয়ে গেছে।

রান্নাঘরের ভাঙা টালির প্রবেশ-পথে কাঁঠাল গাছের আড়ে চাঁদ উঁকি মারছে। ভাতেব থালা নিয়ে খেতে খেতে চাঁদের আলোয় আর দুশ্চিন্তায় কেমন অস্তিত্বটা নরম-নরম হয়ে ওঠে।

সুলতা আবদারের সুবে বললে, দাদা, আমাকে ইস্কুলে ভরতি করে দাও না। লতিকাদি বলছিলেন ওঁদের ইস্কুলে ক্লাশ সেভেন-এ ভরতি করে নিতে পারবেন।

তিমির হেসে বললে, এই বুড়ো বয়সে আবার পড়বার শখ হল কেন তোব ?

—বারে! বাড়িতে বসে-বসে কি করব। আমার ভালো লাগে না। ওই তো ঘোষেদের কমলা দিব্যি ইস্কুলে ঢুকে পড়াশুনা করছে। আজকাল মেয়েদের লেখাপড়া না করলে চলে ? দাও না দাদা আমায় ভরতি করে।

—টাকা কই, বল্ ?

—মোটে তো সাতটাকা লাগবে· ·

তিমিব জলের গ্লাশ টেনে নিয়ে বললে, আচ্ছা দেখি।

সুলতা মুখ ভার করে বললে, তোমাদের সবেতেই 'আচ্ছা দেখি'। কিন্তু আমি মুখ্যু বাড়িতে বসে থেকে কি করব বলতে পার ?

তিমির হাসল। বললে, এবার তোর বিয়ে দেব।

—ছাই। সুলতা গাল ফুলল।—আমার মতো একটা অন্ধ পাথরকে কোন্ ছেলে বিয়ে করবে ? এই বিয়ে দিতেই তো মার

গয়নাগুলো স্যাকরার দোকানে গিয়ে উঠবে, তার চেয়ে ম্যাট্রিক পাশ করতে পারলে আমি চাকরি করতে পারি।

—চাকরি! তিমির হাত নেড়ে বললে, ও আর এ-জন্মে হবে না।

—লক্ষ্মী দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—আমায় ভরতি করে দাও।

তিমির খাওয়া সেরে উঠে পড়ল।

—মা কোথায় রে লতা?

—শরীর খারাপ। শুয়ে পড়েছে।

—হারিকেনটা দিবি—একটু পড়াশোনা করব। ওই আলোতে তো খোকনরা পড়ছে।

—নিয়ে যাও।

রাত্রির বিপুল নির্জনতায় দিনের ছড়ানো-ছিটানো মনটা একেবারে সংকুচিত মোলায়েম হয়ে আসে। চারিদিক অনাবিল নৈশব্দ। শব্দহীন নিশ্চিন্ত সমুদ্রে এবার তলিয়ে দেয়া যায় আপন অস্তিত্বকে। কে আমি? কিসের আমার অহংকার? সমস্ত বিশ্বসাগর মন্থন করেও আমার ব্যক্তি চৈতন্যের কোনো মূল্য মিলবে না।

টেবিলের উপর বইয়ের স্তূপ। জ্ঞান ভাণ্ডার। কি দাম আছে এই জ্ঞান-ভাণ্ডারের! জ্ঞান শুধু দুঃখই বাড়ায়। শেক্সপীয়ার টলস্টয় ব্যালজাক—কেউই বাঁচবার আশ্বাস দেয় না। শুধু মস্তিষ্ককে ক্ষুধার আগুনে প্রজ্বলন্ত করে তোলে। আসল জ্ঞান রয়েছে টাইপ-শেখার মধ্যে। মিত্তির সাহেবই জ্ঞানী-পুরুষ—শেক্সপীয়ার পড়েননি, টলস্টয় ব্যালজাকের নাম তাঁর কাছে বাজে ব্যাপার।

'যুদ্ধ ও শান্তি' বইখানা টেনে নিল তিমির। নেপোলিয়ন ইতিহাসের এক বিনীত ক্রীতদাস মাত্র। নেপোলিয়ন ইতিহাস সৃষ্টি করেননি, ইতিহাস নেপোলিয়নকে সৃষ্টি করেছে।...এ-এক বিরাট জ্ঞান। কিন্তু এ-জ্ঞানের অধিকার না-এলেও পৃথিবীতে বাস করার কোনো অসুবিধে নেই। মিত্তিরসাহেব আজো আমাদের মাথা।

বাইরে থেকে সৌদামিনীর কর্কশস্বর চমকে দিল তিমিরকে।—অনেক রাত হয়েছে।' শুয়ে পড়। রোজ রোজ এত তেল পোড়ালে আসবে কোথা থেকে শুনি ?

ধড়মড়িয়ে উঠে বসল তিমির। আলোটা নিবিয়ে দিল। লেপটা বুকের ওপর টেনে নিতে নিতে আবার মনে হল ঃ অন্ধকার···

সকাল আসে প্রাত্যহিক জীবনে গ্লানির পতাকা তুলে। রোদে-জলে বিবর্ণ ন্যাকড়ার মতো পতাকার ব্যঙ্গটুকু ঝুলতে থাকে ছাদের কার্নিশের মাথায়। পতাকার বুক থেকে সমস্ত রঙ-ই ধুয়ে মুছে গেছে—শুকিয়ে গেছে জীবনের নানান রঙ, আশা আনন্দ, ভবিষ্যত।

সুলতা এসে ফিসফিস করে জিগ্যেস করে, দাদা, তোমার পকেটে পয়সা আছে ?

—কি হবে রে ? ঘুমভাঙা চোখে মাথা তোলে তিমিব।

—ওদিকে মা বাবা কুরুক্ষেত্র শুরু করেছেন। চায়ের জল চেপেছে, চিনি নেই। দিন দিন ওঁরা যেন ছেলেমানুষ হচ্ছেন।

—দেখ্। বোধ হয় আনা চারেক পয়সা আছে—

পয়সা নিয়ে ঝটতি বেরিয়ে গেল সুলতা।

ভেতরের বারান্দা থেকে মার গলার কর্কশ আওয়াজ ভোরের বাতাসকে যেন ছুরির আঘাতে খান খান করে দিচ্ছে। দিনাজপুরের বনেদী দুআনি জমিদার বংশে জন্মাবার সঙ্গে আজকেব দুর্ভাগ্যকে কিছুতেই মেলাতে পারেন না সৌদামিনী। চণ্ডীচরণও থামবার পাত্র নন। তাঁর বংশগরিমার তেমন আদর্শ নজির না-থাকলেও কর্মগরিমা কম নয়! একদিন যে-রাশিরাশি টাকা এনে সৌদামিনীর আঁচল ভরতি করেছেন তার হিসাব নিতে চান আজ।

হাসি পায়, কষ্টও হয় তিমিরের ওঁদের এই কাণ্ড কারখানা দেখে। মাথার ওপরে চুনখশা দেয়ালে এখনো মা বাবার বিয়ের সেই ফটোটা তেমনি করে টাঙানো রয়েছে। মার কপালে ঠাকুমার

এঁকে দেয়া সেই সিঁদুরের বিন্দুটি আজো জ্বলজ্বল করছে। মা তখন তেরো বছরের নোলক-পরা সলজ্জ বধূ, বাবার বয়েস ত্রিশ।… তারপরও উনত্রিশটা বছর কেটে গেছে।

তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল তিমির।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছোট ভাইবোনেরা মা বাবার কলহ থেকে নিত্যকার পাঠ নিচ্ছে, হাসছে, বস্তির ছেলেমেয়েদের মতো কুৎসিত অঙ্গভঙ্গী করছে।

—তোমরা এখানে কি করছ? যাও, পড়তে যাও। ধমকে ওদের বাইরে পড়বার ঘরে পাঠিয়ে দিল তিমির।

চাপা রাগে সমস্ত শরীরটা গরগর করতে থাকে। কথা বলে না। কথায় শুধু কথা বাড়ে।

চা খেয়ে জামা গায়ে বেরিয়ে পড়ল বাসা থেকে।

আটটা থেকে দু-ঘণ্টা অপচয় করে আসতে হবে গাঙ্গুলিদের কনিষ্ঠ সন্তানের কল্যাণে আমার অভাবে যার নাকি পরীক্ষা-সাগর উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হবে না। ছেলেটি একেবারে নির্ভেজাল গাধা। আজো 'সে যায়' লিখতে 'he go' লেখে। দু-ঘণ্টা নারকীয় শাস্তি ভোগ করে মেলে কুড়ি টাকা।

বেরোবার মুখে তরুণ বলে, দাদা, আমাকে এ-অঙ্কটা বুঝিয়ে দাও না।

—এখন না, পরে। রাস্তায় নেমে পড়ে তিমির।

অদ্ভুত ভালো লাগে এই রাজপথ…এই পথিকপায়ের ছন্দ, কলকণ্ঠ—টলস্টয়ের 'চলমান প্রবাহ' মুভিং ফোর্স…এরাই ইতিহাস তৈরি করে, ইতিহাসের মোড়ে মোড়ে এদেরই বিচিত্র জয়োল্লাস। কিন্তু এদের নিয়ে বোধ হয় কোনোদিন ওঅর এণ্ড পিস্ লেখা হবে না।

মাথার ওপরে রৌদ্র-চকিত শানিত সুনীল আকাশ। আর ওই মেঘগুলো বোধকরি মাটির [illegible] পুঞ্জীভূত স্বপ্নের আধার।

চোখের কালো জলে মাটি ভিজিয়ে দিলেও মানুষের স্বপ্ন দেখার সাধ কোনোদিন মিটবে না। পৃথিবীর কবিতা কোনোদিন ফুরবে না।

ভূপতি নন্দীর মুদিখানার পাশ দিয়ে যেতেই আবার সেই চেনা স্বর।—এই যে তিমির বাবু—

মোটা কালো লোমশ, চোখে চাঁদির চশমা আঁটা মানুষটিকে দেখলেই বিরক্তি আসে তিমিরের। পুথি পড়ার মতো রোজ রোজ একই কথা শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে।

—কই মোক্তারবাবু তো এলেন না। বাবার বাৎসরিক কাজ। বাকি টাকাটা পেলে খুব উপকার হত তিমিরবাবু। জানালেন ভূপতি নন্দী।

তিমির বললে, বাবাকে বলব আপনার কথা।

—দয়া করে বলবেন এই হপ্তার মধ্যে ব্যবস্থা করতে। বুঝতেই তো পারেন।

—বলব। ছিটকে বেরিয়ে এল তিমির। তাড়াতাড়ি পা বাড়াল।

গাঙ্গুলিদের বাড়ির পুরনো ফটক। বিক্রমপুরের বিরাট জমিদার। পুরনো ঠাট বজায় রাখতে গিয়ে একতলাব সব কটা ঘরই ভাড়া হয়ে গেল। মোটর গ্যারাজ, মারওয়াড়ীব বিড়ির মশলার গুদম, উষা সেলাইকল, ওষুধের দোকান। দোতলায় কর্তারা থাকেন। লম্বা হলঘরে ধূলি ধূসর ছেঁড়া কার্পেট, দেয়ালে দিল্লী দরবারের ছবি, পিতৃ-পুরুষের পোর্ট্রেট গ্যালারি, সিলিংএর সঙ্গে ঝোলানো অব্যবহার্য গোটা কয়েক ঝাড় লণ্ঠন।

সিঁড়ি বেয়ে হলঘরে উঠে ছোকরা চাকরটাকে খবর দিতে বলল তিমির।

রাম খবর নিয়ে এল, ছোটদাদাবাবু চা খেয়ে আসছেন।

তিমির জুতো খুলে কার্পেটের ওপর বসল।

রাম ভয়ে ভয়ে চারদিকে চেয়ে নিচু গলায় বললে, মাস্টারবাবু, একটা কথা বলব ?

—কি রে ? বিস্মিত হয়ে ওর দিকে চোখ রাখল তিমির।

—বড্ড বিপদে পড়েছি মাস্টারবাবু। ছোটদাদাবাবু আমার কাছে পাঁচটাকা ধার নিয়েছিলেন, বন্ধুদের সিনেমা দেখাবেন বলে। আজ তিনমাস হয়ে গেল সে-টাকা চেয়ে চেয়েও পাচ্ছিনে। কর্তাবাবুকে বলতে ভয় হচ্ছে। এদিকে দেশে আমার ভাইয়ের অসুখ। রাম কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললে।

তিমির নিস্পৃহ গলায় বললে, তার আমি কি করব বল ?

রাম বললে, আপনি দাদাবাবুকে বললে....

তিমির বললে, আমার বলা কি ভালো দেখাবে ? আচ্ছা দেখি—

বই কাঁধে ছোট দাদাবাবু পড়তে এলেন। সদ্য ব্যাকব্রাস করা চুল, যত্নে ছাঁটা গোঁফের কারুকার্য, মুখময় পাউডারের প্রলেপ।

বসতে বসতে বললে, আচ্ছা মাস্টারমশায় আপনি থ্রী মাস্কেটিয়ার্স দেখেছেন ?

বিরক্ত গলায় তিমির জানাল, না।

ব্রজবিহারী মাস্টারের দিকে চেয়ে যেন এক আজব জীব দেখছে। বিংশ শতাব্দীতে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, সেইটেই আশ্চর্যের। বললে, দেখেননি ? উরেফ্ ফাদার ! কি সোর্ড খেলা....

গম্ভীর হয়ে তিমির আগামী কালের পড়া জিগ্যেস করল।

—ইস্কুলে পড়া দেয়নি। হয়তো বেমালুম মিথ্যাই বলে দিল ব্রজবিহারী।

—বেশ। তাহলে ট্রানশ্লেশন কর। তিমির ঢোঁক গিলে বললে, ভালো কথা। রাম বলছিল...তুমি নাকি তার কাছ থেকে টাকা নিয়েছ, মানে....

—হোয়াট। বাঘের বাচ্চা বাঘ। এক মুহূর্তে ক্রোধে জানোয়ার হয়ে উঠল ব্রজবিহারী। চিৎকার করে বললে, রাম নালিশ করেছে! ব্যাটাচ্ছেলেকে আমি জুতিয়ে মুখ ভেঙে দেব।

তিমির প্রমাদ গণল।—এই ব্রজ, ছিঃ এত উত্তেজিত হচ্ছ কেন?

ব্রজবিহারী বললে, আপনি চুপ করুন। আমার প্রেষ্টিজ নেই! গাঙ্গুলি পরিবারের ছেলে নই আমি? বাইরের একজন মাস্টারের কাছে আমার অপমান! ঝড়েব মেঘের মতো উধাও হল সে।

বিরাট হলঘরের মধ্যে দিল্লী দরবারের ছবির নিচে স্তম্ভিত হতবাক দাঁড়িয়ে রইল তিমির।

খানিক পরে রামকে কোথা থেকে টানতে টানতে নিয়ে এল ব্রজবিহাবী।—শালা, ছোটলোকেব বাচ্চা, কি বলেছিস মাস্টারের কাছে, এঁ্যা?

রাম ভয়ার্ত পশুর মতো পা জড়িয়ে ধরল ব্রজব। ছোটদাদাবাবু তিমিরেব সামনেই পায়ের নাগরা খুলে উন্মত্তের মতো প্রহার করতে লাগল নিরীহ ছোকরাটিকে। রাম ছটফট করতে করতে পালিয়ে এসে তিমিরের পা আঁকড়ে ধরল।—মাস্টারবাবু আমাকে বাঁচান।

তিমির ব্রজবিহারীর হাত চেপে ধরল।—থাম।

ব্রজবিহারী ঝাঁকুনি দিযে হাত ছাড়িয়ে নিল।—আপনি আজ চলে যান মাস্টারমশায়। আমার চাকরকে আমি শাসন করব।

তিমির মরিয়া হয়ে বললে, না।

—হোয়াট। ব্রজবিহারী গর্জন করে উঠল।—আপনি চলে যান মাস্টারমশায়, নইলে আপনার সম্মান রাখা সম্ভব হবে না।

তিমির ব্যঙ্গ করে বললে, আমার সম্মান যথেষ্ট রেখেছ তুমি। এখন স্থির হও।

ব্রজবিহারী আবার চিৎকার করে উঠল।—আপনি রামকে ছেড়ে দিন মাস্টার মশায়, আমি বলছি···

—শাট্ আপ। ঘটনাটা ত্বরিতে ঘটে গেল। কিছু বুঝে উঠবার আগেই তিমিরের এক ঘুঁসিতেই কার্পেটের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল ব্রজবিহারী। আবার ওঠবার চেষ্টা করতেই এক জোড়া ভারি লাথির ঘায়ে একেবারে নির্জীব হয়ে পড়ল সে।

জুতো পায়ে গলিয়ে উত্তেজিত ঘর্মাক্ত শরীরে দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল তিমির। রাস্তায় বেরিয়েই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল যেন। 'পৃথিবীর কবিতা কোনোদিন ফুরয় না।' নিজের মনেই হাসির রুদ্র-ফাল্গুন জাগল। মাসিক কুড়িটাকার একটি নিশ্চিন্ত দুর্গ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল।

সারা দুপুর মাতালের প্রলাপের মতো কাটল।

মনের উত্তেজনাকে শীতল করে অনেক বেলায় বাড়িতে ফিরল তিমির।

ক্লান্ত শ্রান্ত শরীরে তক্তপোশের ওপর স্থির হয়ে বসল। দেহে-মনে বিশ্রী এক গ্লানি। কেমন নিঃস্ব নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে নিজেকে। ছোট বেলায় চূড়ামণি যোগে মেলায় হারিয়ে গিয়ে এমনি বোধ হয়েছিল সেদিন। মেলার জনতার মধ্যেও যেন সে এক, একাকী। মানুষের দুঃখবোধের কোণটুকু বড় নির্জন, সেই নির্জন মনের যন্ত্রণার দোসর নেই, অবলম্বন নেই।

সুলতা গুনগুন করতে করতে এসে বললে, দাদা, তোমার গেঞ্জিটা দাও। ভীষণ ময়লা হয়েছে।

তিমির হেসে বললে, তোর ওই একটুকরো সাবান দিয়ে কি এই ময়লা দূর হবে।

সুলতা বললে, তাহলে আমাদের বউদি এনে দাও—

হো হো করে হেসে আর্তনাদ করে উঠল তিমির।

সুলতা রোষ ভরে বললে, কি বিদকুটে তোমার হাসি বাপু।

চুপ করে গেল তিমির। এ-বাড়িতে সবাই রামগরুড়ের ছানা। হাসি বেআইনী। তবু···অন্তরের অন্দরমহল থেকে যখন যন্ত্রণার ক্ষুদে দানবগুলো উলঙ্গ হয়ে পড়তে চায় তখন হৃৎপিণ্ডকে চেপে ধরে বিসুবিয়াসের মতো হাসির দাপটে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করে।

—দাদা, দেখ-দেখ। ফ্যাকাসে বিবর্ণ মুখ সুলতার। তার হাতে ধরা তরুণ-তপনের ময়লা জামা।

—কি রে?

—এই দেখ—এদের পকেটে বিড়ির টুকরো।

চমকে ওঠবার চেষ্টা করেও চমকাতে পারল না তিমির। চোদ্দ থেকে পনরো বছরের তুটি ছেলে। একজন ক্লাশ নাইনে, আর একজন প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী।

—দাদা, তুমি কিছু বলবে না ওদের, শাসন করবে না? সুলতা রাগে কাঁপতে থাকে।—ওরা যে একেবারে বকে যাচ্ছে।

তিমির বললে, হুঁ···

—তোমার সবেতেই হুঁ। জান, আরো কত নিচে নেমে গেছে ওরা। সিনেমা হলে গিয়ে ইয়ার্কি মারে। মেয়েদের দেখলে যা-তা মন্তব্য করে···

তিমির মূক।

—দাদা, তুমি মরে গেছ···

তিমির ম্লান গলায় বললে, কি করব বল্? ওই ধাড়ী ছেলে তুটোকে মারব?

সুলতা মুখ বাঁকিয়ে বললে, না, ধূপধুনো দিয়ে পুজো করবে। দাদা তুমি কি।··লম্বা লম্বা পায়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

সুলতা রাগ করে গেল। বাড়ির গণ্ডির বাইরে যে-বিরাট জীবন নর্দমায় ডাস্টবিনে ফুটপাথে গ্রীষ্মের কুকুরের মতো জিভ বার করে

খুঁকছে তার পরিচয় রাখে না স্নলতা। বন্যার জল যখন পথ-ঘাট-মাঠ ভাসিয়ে নেমে আসে তার হাত থেকে খিড়কির পুকুরকে বাঁচানো যায় না।

রান্নাঘর থেকে সৌদামিনীর চিৎকার।—কতক্ষণ হেঁসেল নিয়ে বসে থাকব, হ্যাঁরে তিমির—

—যাই মা। তিমির ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

চৈত্রের তালকানা বাতাসে ধুলো উড়ছে। জানলা খুলে রাখলে মহাদেবের ঝোলা থেকে বেরিয়ে এসে ধুলোর প্রেতগুলো হুড়মুড় করে ভেঙে পড়বে ঘরের মধ্যে।

জানলা বন্ধ করে দিল সুলতা।

রোদের মাদক রসে সারা বাড়িটা ঝিমচ্ছে। ও-ঘরে মা বাবা দিবানিদ্রায় অলস। দাদা বেরিয়েছে নিত্যকার চাকরি শিকারে। ভাইয়েরা ইস্কুলে। তরুণ ম্যাট্রিকের পড়া তৈরি করতে গেছে বন্ধুর বাড়ি।

গায়ের জামাটা সেলাই করতে করতে হাঁপ ধরে যায়। চোখ জ্বালা করে, ঘুম আসে না। কুয়োতলায় বালতির জল নিয়ে দুটো কাক তোলপাড় করছে। কাঁঠাল গাছের গুঁড়ি বেয়ে কাঠবেরালিটা তরতর করে নেমে এল, একবার ঘাড় দুলিয়ে চারদিক চেয়ে নিল, তারপর পেছনের ল্যাজটা ফুলিয়ে আবার ছুটন্ত পায়ে গাছের ওপর উঠে গেল।

হঠাৎ সদর দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ।

সুলতা বাইরের ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

—কে ?

—এইটে কি চণ্ডীবাবুর বাড়ি ? বাইরে পুরুষেব গলা।

সুলতা দরজা খুলল।—কাকে চাই ?

সুটকোটে মোড়া ছিপছিপে সুবেশ স্বাস্থ্যবান যুবক। চোখে লাইব্রেরী ফ্রেমের চশমা। কুতূহল-ঘন চোখ। পেছনে কুলির মাথায় বেডিং সুটকেস।

যুবকটি নিঃসংকোচ হেসে জিগ্যেস করল, চণ্ডীবাবু বাসায় আছেন ?

—হ্যাঁ।

—দয়া করে একবার খবর দেবেন ? আমি জলপাইগুড়ি থেকে এই ট্রেনেই আসছি। আমি দেবজীবনবাবুর ভাগ্নে···

সুলতা বললে, বসুন। বাবাকে ডেকে দিচ্ছি।

চণ্ডীচরণ দিবানিদ্রা ছেড়ে বাইরে এলেন।

দরজার আড়াল থেকে ওঁদের কথাবার্তা কানে আসছিল সুলতার।

বাবা বললেন, তুমি দেবজীবনের ভাগ্নে। বদলি হয়ে এসেছ এখানে কো-অপারেটিভ-এ? কী নাম বললে? সৌরেশ—সৌরেশ দে···

সৌরেশের গলার মৃদু স্বর শোনা গেল না।

বাবা আবার বললেন, বেশ তো। তুমি যতদিন কোনো ব্যবস্থা করতে না পার থাক না এখানে। এ তো তোমার নিজের বাড়ি। আর এই ঘব তো আমার খালিই পড়ে আছে। দেবজীবন যে আমার কত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল···

দাদার ঘরে এসে ধপ করে বসে পড়ল সুলতা। বাবার যেমন কাণ্ড! এ কি একটা বাড়ি যে বাইরের লোককে অমনি হঠাৎ থাকতে বলা যায়। শহরে হোটেল-বোর্ডিঙেব অভাব নেই। বাইরের লোককে বড় ভয় সুলতার।

—খুকি! চণ্ডীচরণ হাকলেন।—ছেলেটির খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয় যে। তোব মা তো শুযে পড়েছে।

সুলতা গুম হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। তাবপর মুখ কালো করে উঠে গেল রান্নাঘরেব দিকে। এ-সংসাবে একজন রাঁধুনির চেয়ে বেশি সম্মান নেই তার। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার আর কি দাম আছে তার কাছে। উনুনে ফুঁ দিতে দিতে চোখে জল আসে তাব।

চণ্ডীচরণ বারান্দা থেকে আবার ডাকলেন।—ওরে খুকি, সৌবেশ যে আগে চান করবে বলছে। এক বালতি জল তুলে দিস।

একদিনে যেন হঠাৎ আত্মসম্মানবোধ মাথা চাড়া দিয়ে উঠল সুলতার। তার অসহায়ত্বের সুযোগ নিয়ে এইভাবে তাকে ছোট করবার মানে কি। মেয়ে হয়ে জন্মে সে এমন কি অপরাধ করেছে। বাইরের কোনো বাবুর জন্যেই জল তুলে দিতে সে পারবে না—পারবে না—পারবে না।

*　　　　*　　　　*

খাওয়াদাওয়া সেরে সৌরেশ আপিসে জয়েনিং রিপোর্ট দিতে বেরিয়ে যাবার পরও অনেকক্ষণ পাথরের মতো বসে রইল সুলতা। এতক্ষণ উনুনের আঁচে বিরুদ্ধ মনের জ্বালাটা ধীরে ধীরে জুড়িয়ে স্বাভাবিক হয়ে এল। বিকেলে ঘর ঝাঁট দিয়ে বিছানা পেতে দেবার সময় বাইরের ঘরে ঢুকে সৌরেশের বিছানাটাও পরিপাটি করে পেতে দিতে ভুলল না।

ইস্কুল-ফেরত ছেলেরা এসে নতুন সুটকেসের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তপন বললে, কে এসেছে রে দিদি ?

সুলতা ঠোঁট উলটে বললে, অডিটারবাবু···

—খুউব বড়লোক নারে দিদি ? আমাদের সিনেমা দেখাবে না ?

—খবরদার তপু, ভদ্রলোকের সঙ্গে যদি অসভ্যতা কর তো মজা দেখবে। দাদাকে বলে মার খাওয়াব।

তপন বললে, বারে ! আমি কি সিনেমা দেখতে চাচ্ছি নাকি ? দিদি ··খিদে পেয়েছে···

—আয়····

সন্ধ্যেবেলা কিন্তু তপনকে বাড়িতে পাওয়া গেল না। আর সেই সঙ্গে সৌরেশও নিখোঁজ।

অনেক রাত করে বাড়ি ফিরল তিমির।

—কে ? খোকা ?

—হ্যাঁ।

আজ আর কিছু জিগ্যেস করলেন না চণ্ডীচরণ। কিন্তু, এই চুপ করে থাকাই আর-এক শাস্তি। এর চেয়ে বাবা যদি চিৎকার করতেন, গালাগালি দিতেন, তাহলেও বোধ করি এতটা অসহ্য লাগত না।

তক্তপোশের বুকে ভেঙে পড়ল তিমির। বেঁচে থাকার এত গ্লানি, এত লজ্জা! জীবন এত কৃপণ কেন!

—দাদা, খাবে চল।

সুলতা! সুলতার চোখের দিকে চেয়ে আজ ওকে হঠাৎ এত ভালো লাগল কেন! অন্যদিনের চেয়ে বেশ-বাসে একটু যত্ন নিয়েছে সে। মুখে হিমানীর সুবাস, চোখে কাজল টেনেছে, কপালে খয়েরী টিপ জ্বলজ্বল করছে।

—বারে! কি দেখছ অমন হাঁ করে। সুলতার সলজ্জ মুখ।

—চল্ যাই।

কেমন আশ্চর্য অস্বাভাবিক লাগছে সুলতাকে। সংসারের চাকায় ঘা খাওয়া সুলতাকে কেমন আত্মহারা বোধ হচ্ছে।

—জান দাদা, বাড়িতে অতিথি এসেছেন। বাবার ছেলেবেলাব বন্ধু দেবজীবনবাবুর ভাগনে··সৌরেশবাবু কো-অপারেটিভ-এর অডিটার···

তিমির বললে, তাই নাকি? বাইরের ঘরে মশারিব মধ্যে কে একজন শুয়ে আছে দেখলাম, ভাবলাম বাবার মক্কেল-টক্কেল হবে।

—তপনের কি কাণ্ড দেখ দাদা। হাসিতে ফুলতে থাকে সুলতা। —কী ভীষণ হ্যাংলা। ভদ্রলোককে ধরে সিনেমায় চলে গেছে।

—ছেলেমানুষ। ওর কি বুদ্ধি আছে? তিমির হাসল।

—ছাই!

বাইরে বসন্তের এলোমেলো হাওয়া ঘরের জানলা-দরজা কাঁপিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। আকাশে পূর্ণ চাঁদের মায়া। আর হালকা মেঘের ঢেউ। 'বসন্তে কি কেবল শুধু ফোটা ফুলের মেলা রে!' স্বপ্ন বুনবার রাত্রি বটে! পৃথিবীর কাব্য কোনোদিন ক্ষয় হবার নয়! হাতের পাঁচ আঙুলের ফাঁকে ভাতের দলা মাখ, রান্নাঘরের পেছনে রাস্তার কাঁচা নর্দমাটা থেকে আসুক গন্ধরাজের সুরভি, মশা আর রাতকানা মাছি, আর ভাঙা টালির চন্দ্রাতপের রন্ধ্র থেকে চাঁদের হিলহিলে জ্যোৎস্না।

রাস্তায় দেখা সতীর্থ জগদীশ ধরের সঙ্গে। ছিটের কোট-প্যাণ্ট, মাথায় শোলার টুপি, চোখে গগল্‌স। মাথা থেকে পা পর্যন্ত একটা খেপাটে ব্যস্তত্রস্ততা। টাইম ইজ মানি। সময়ের ছুটন্ত প্রবাহের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যেন প্রতিযোগিতায় নেমেছে। জগদীশ জীবন-যোদ্ধা। কলেজ-জীবনের বিদ্যাসাগর-বর্ণিত কেতাবী সুবোধ ছেলে জগদীশ নয়। এ-এক নতুন মানুষ, আজকের যুগের নৌকোয় পাল-তুলে-দেয়া।

প্রায় সাত বছর পরেও বদলায়নি কেবল ওর আকাশফাটা হাসির ভঙ্গী। মরুভূমির মতোই শুষ্ক, রুক্ষ, কঠোর।

ওব হাসিব বেগ থামবার যথেষ্ট সময় দিয়ে হেসে জিগ্যেস করল তিমির।—এতদিন কি করছিলে?

জগদীশ পানখাওয়া ছোপ-পড়া দাঁতের প্রদর্শনী করে বললে, অতীত থাক ব্রাদাব। ওটা দ্রৌপদীর শাড়ির মতো টানলে কিছুতেই ফুরবে না। জীবনে অনেক কিছুই তো করবার চেষ্টা করলাম। রাজনীতি থেকে পাটের আড়ত। অনেক কাদা-জল ঘেঁটে বেঁচে থাকাকেই সার জানলাম। বাঁচ এবং বাঁচাও—এই হল আমার জীবন-মন্ত্র। বলে কোটের পকেট থেকে একটি বিড়ি বার করে ধরাল।

তিমির হেসে বললে, তোমার জীবন-মন্ত্রে নতুনত্ব কিছু নেই।

জগদীশ বললে, নতুনত্ব কটা কথারই আছে ব্রাদার। জীবনের চলতি-হাটে ওটা মাল কাটাবার ট্রেড-সিক্রেট। বলেই হা হা করে বিপর্যয় হাসি হেসে উঠল।

—কিন্তু এখন করছ কি?

জগদীশ বিড়ির ধোঁয়া ছেড়ে বললে, ইনসুরেন্সের অর্গানাইজার। ভালো কথা, ইনস্যুওর করেছিস তো?

তিমির বললে, না···

জগদীশ বিস্মিত হয়ে বললে, এখনো করিসনি! আচ্ছা, আমার কোম্পানিতেই করে দেব দু-হাজারের একটা।

তিমির হেসে বললে, দিতে পার। প্রিমিয়াম তোমাকেই চালিয়ে যেতে হবে।···দেড় বছর ধরে চাকরি জুটছে না।

জগদীশ আবার হা হা করে হেসে উঠল।—তুই দেখছি একেবারে আকাট মূর্খ। চাকরি নেই বলেই তো ইনস্যুওর করবি। সে-কায়দা তোকে বলে দেব খন। শুধু আমার সঙ্গে লক্ষ্মণ-সহোদরের মতো থাক্।

বিদায় নেবার আগে আর একটা বিড়ি ধরিয়ে তাকে বাড়ির ঠিকানা দিতে ভুলল না জগদীশ। বললে, অমনি বউদির সঙ্গেও আলাপ করে আসবি।

ঝড় চলে গেলেও যেমন তার গন্ধ থেকে যায় অনেকক্ষণ তেমনি জগদীশের বিদায় নেবার পরেও ওর মূর্তিটা জেগে রইল তিমিরের চোখের পর্দায়। দুঃখ-কষ্টের শিলাবৃষ্টিতে অতীতে কলেজযুগে কতদিন পরস্পরকে তারা সান্ত্বনা দিয়েছে, আশ্বাস দিয়েছে। অন্ধকার মেঘ চিরে স্বর্ণ সূর্য দিনের প্রতীক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছে। 'দিনগুলি মোর সোনার-খাঁচায় রইল না।' জীবনে কোনো স্বপ্ন দেখাই কি ভুল! জগদীশ কি জীবনের এই পরিণতিতে সুখী হয়েছে!

আপিস পাড়ার উদ্দেশে পা চালাল তিমির।

টিফিনের সময়। ব্যোমকেশকে পাওয়া গেল 'তৃপ্তি ও শান্তি' ক্যাবিনে। ব্যোমকেশ জাত কেরানী। ওর বাবা ছিল কালেক্‌টরির নাজির। ছেলে ম্যাট্রিক পাস করল সতরো বছরে, আর সেই বছরেই নাজিরবাবু ঢুকিয়ে দিলেন তাকে নিচের তলার ক্লার্ক করে। পঞ্চান্ন থেকে মাইনে উঠেছে নব্বই-এ, একশ পঁয়ত্রিশে উঠে চূড়ান্ত ক্ষান্তি দেবে। দুর্গত বন্ধুদের চাকরি দেবার উৎসাহে আজো তার ঘাটতি পড়েনি।

—নিবারণ আর এক কাপ চা দাও। ব্যোমকেশ পাশে সরে গিয়ে বসতে দিল তিমিরকে।

তারপর সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে, তোর জন্যে বড় মুশকিলে পড়লাম ভাই। কি যে বাজার পড়েছে। কোথাও কোনো পোস্ট খালি নেই।

তিমির মৌন। ওর আক্ষেপ নিত্যকার, তার কোনো জবাব নেই। বাজার যে খারাপ তা তো আর নতুন করে জানবার কিছু নেই। আসল কথা—তদবির আর তকদির।

—দেখি। আজকেও একবার বলব ও. এসকে। চিন্তিত মুখে বললে ব্যোমকেশ। —আচ্ছা মিছিমিছি বসে না থেকে টাইপ ক্লাসে ভরতি হয়ে যা না।

তিমির নীরবে চায়ে চুমুক দিয়ে চলল।

সময়গুলো যেন ভারি পাথর। কেমন এক দুরন্ত লজ্জায়, হীনমন্যতায় নিজেকে অসার্থক মনে হয়। মানুষের শারীরিক বিকৃতি নিয়ে কেউ কৌতুক করলে যেমন অপমানকর লাগে। এক টাইপ না জানার অক্ষমতা তাকে বিশ্বশুদ্ধ লোকের কাছে যেন উপহাসের পাত্র করে তুলেছে।

দুপুরের রোদে খাঁ খাঁ করা পার্কটায় এসে চুপ করে এক গাছের তলায় পা ছড়িয়ে বসল তিমির। অবসন্ন রোদে ঝিমচ্ছে খালি বেঞ্চগুলো। পাতাঝরা বুড়ো গাছটার ডালে একঘেয়ে বিরক্তির সুরে কাক ডাকছে।

বাঁ ধারে ঝোপের আড়ালে ঘাসের শয্যায় চিত হয়ে শুয়ে পড়েছে উড়ে মালী। কৃষ্ণচূড়ার গাছের গোড়ায় তিলককাটা গামছা কাঁধে গনৎকারকে ঘিরে বাবুদের বাড়ির ঠাকুর চাকরদের ভাগ্যপ্রদর্শণী চলেছে।

—বাবু, চীনেবাদাম চাই? বারো তেরো বছরের কিশোর ফেরিওয়ালা।

—না।

সময় কাটছে।

সময় কাটে না সুলতার।

এত ক্লান্তি, মাগো, এত ক্লান্তি কেন।

কি উৎকট গরম। সমস্ত শরীরের ভেতরটা যেন আগুনের মতো জ্বালা করছে। ঘামে লেপটে গেছে বুকের অন্তর্বাস। ইঁদারার পাড়ে গিয়ে ঘটি ঘটি জল ঢাললেও যেন এই জ্বলুনি কমবে না। বুকের ওপরে মেলে ধরা শরৎচন্দ্রের পরিণীতা। কতবার যে বইটা পড়েছে আর নিজেকে মনে মনে ললিতার সঙ্গে সমান করতে চেয়েছে।

সদর দরজায় ভারি জুতোর শব্দ।

কে এল এই অসময়ে?

—কে?

—দরজা খুলুন। আমি। সৌরেশের গলা।

বুকের ভেতরে বদ্ধ পাখিটা ডানা ঝাপটিয়ে ধড়ফড় করে উঠল। কোথা থেকে একটা বিশ্রী দুর্নিবার লোভ তার নিজেরই রক্তে পাক খেয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। দম বন্ধ হয়ে আসে যেন।

দরজা খুলে দিল।

সৌরেশ আপিসের পোশাকে এসে ঘরে ঢুকল।

—সকাল থেকে বিশ্রী মাথা ধরে রয়েছে, সৌরেশ বললে।

সুলতা মৃদুস্বরে বললে, চা করে দেব?

—এক গ্লাস জল দিন। এনাসিনটা খেয়ে ফেলি—।

জল নিয়ে এল সুলতা। বিছানায় গা ছড়িয়ে দিয়েছে তখন সৌরেশ। চোখেমুখে অব্যক্ত যন্ত্রণার ছায়া।

—খুব কষ্ট হচ্ছে কি? জলের গ্লাস এগিয়ে দিয়ে জিগ্যেস করল সুলতা।

—না। কিছু নয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে আসা উচিত ছিল, তবু চলে আসতে পারে না। অসুস্থ মানুষটিকে ছেড়ে স্বার্থপরের মতো আসেই বা কি করে।

ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। তারপর নীরব চরণে বেরিয়ে গেল।

নিজের ঘরে ফিরে এসে যেন আরো ক্লান্ত লাগছে। নির্জন অসহায় মনে হচ্ছে নিজেকে। মানুষের মাথা ধরে কেন! কই, তার তো একদিনও মাথা ধরেনি। মাথা ধরলে কি খুব কষ্ট হয়, কে জানে।

বিকেল নামছে ধূলিধূসর। গৈরিক ছোপ বৈরাগী আকাশের গায়ে।

একটু পরেই হুড়মুড় করে ক্ষুদে রাক্ষসের মতো ভেঙে পড়বে ভাই বোনের দঙ্গল। যতখানি শক্তি ধরে কণ্ঠনালীতে চিৎকার জুড়বে। —দিদি খেতে দাও…দিদি খেতে দাও। দুপুরের হাঁপ-ধরা ক্লান্তির পরে এই সময়টুকু যেন কাজে আব খুশিতে আনন্দেব বান ডাকে। নিজেব নিঃসঙ্গ বিড়ম্বিত জীবন নিয়ে মলাটবদ্ধ বইএব মতো নিঃসাড়ে পড়ে থাকতে হয় না। বেঁচে থাকার আলাদা অর্থ খুঁজে পায় সে। নিজের বেঁচে থাকার সংকীর্ণ ইচ্ছাটাকে মিলিয়ে দেয় সংসারের আবর্তেব মধ্যে যেখানে সে ভাইবোনেদের প্রীতিরসে স্নেহশীলা দিদি।

কিন্তু, আজ ওরা এত দেরি করছে কেন ফিরতে। ওরা চোখে চোখে থাকলেও জ্বালা, দূরে গেলে ভাবনা চিন্তাগুলি যেন আরো তাড়া করে গিলতে আসে।

রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল সুলতা। উনুনে আঁচ দিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দিল।

চায়েব কাপ হাতে নিয়ে ধীব পায়ে এসে ঢুকল সৌরেশের ঘবে।

সৌরেশ শুয়ে শুয়ে কি একটা বিলিতী ম্যাগাজিন পড়ছিল। হেসে বললে, চা তো আমি চাইনি।

কথার ভঙ্গীতে সারা শরীর জ্বলে উঠল সুলতার। রাগে দুঃখে কালো হয়ে উঠল মুখটা। থরথর করে কেঁপে উঠল ঠোঁট। তারপর চায়ের কাপটা নিয়ে পিছন ফিরে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হতেই খপ করে

ওর হাত চেপে ধরল সৌরেশ। কাপটা ছিনিয়ে নিয়ে বললে, কথার ভরও সয় না ?

হাতের কবজি থেকে সারা দেহে শোণিতে-শোণিতে আছড়ে পড়ল এক উগ্র বিষের প্রদাহ। মড়ার মতো ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মুখটা। হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এ কি দুরন্ত মাতলামি। টলতে টলতে বেরিয়ে গেল সুলতা।.

রান্নাঘরের এক রাশ ধোঁয়ার মধ্যে নিজেকে সংযত করতে যথেষ্ট সময় নিল তার। দাঁতে দাঁত এঁটে অনেকক্ষণ শোকাহতের মতো অনড় বসে রইল। কখন শ্রাবণের বর্ষার মতো চোখের জলে বুক ভেসে গেল, খেয়াল রইল না।

রাত্রি। ··

অন্ধকারে লেপেমুছে গেছে আকাশ আর পৃথিবী। তাবাদের নৈশ অভিসার আজ বন্ধ। অন্ধকার আকাশপটে মোটা মোটা তুলির আঁচড়ে কালিঢালা ঝাঁকড়া গাছ দুটো স্থির, নিষ্কম্প।

ঘুম নেই চোখে সুলতার। একটু আগে বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়েছে বিছানায়। পিঠের ওপর কালো চুলের ভার আলুলায়িত, গায়ের শেমিজ বিপর্যস্ত, ঘর্মাক্ত, পীনোদ্ধত কঠিন স্তনদেশ সমুদ্রের ঢেউয়ের ছন্দে ওঠানামা করছে, পরনের শাড়ি স্খলিত।

সুলতার দুর্বল ঘুমন্ত চেতনায় কে যেন চাবুক মেরে উৎপীড়ন করে গেছে।

ছি ছি ছি। তলপেট থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত একটা তীব্র বিবমিষা তাকে পিষে ফেলতে চাইল।

জগদীশের সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে দেখা করল তিমির।

মহানন্দার ধারে অভিরামপুরে নতুন একতলা বাড়ি। বাড়িওলা

থাকে পাটনায়। দুখানা মাত্র শয়নঘর। এরই মধ্যে জগদীশের ছোট্ট সংসার রচনা স্ত্রী এবং শিশুকন্যাকে নিয়ে।

আদুড় গায়ে মেয়েকে কাঁধে চাপিয়ে বারান্দায় পায়চারি করছিল জগদীশ।

বললে, বেটার লেট দ্যান নেভার। আয়।

রাস্তার দিকের ঘরটায় এসে বসল দুজনে। ঘরের মাঝখানে চৌকোনো টেবিল। আর গুটি তিনেক চেয়ার। দেয়ালে রামকৃষ্ণের ছবি। পাশেই হিন্দি সিনেমার কোনো অভিনেত্রীর প্রতিবিম্ব সমেত বাটার জুতোর ক্যালেণ্ডার, আর তারিখগুলো লাল-নীল পেন্সিলে মাঝে মাঝে কলঙ্কিত।

—ওগো, কে এসেছে দেখ। ওখান থেকেই হাঁক ছাড়ল জগদীশ।

বিব্রত বোধ করে তিমির বললে, আহা, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন।

জগদীশ হেসে বললে, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। মানে গৃহিণী গৃহের চেয়েও উঁচু। বাড়িতে পা দিয়ে প্রথম দর্শন চাই গৃহিণীর।

গৃহিণী দর্শন দিলেন। বছর ষোল-সতরোর বালিকা-বধূ। একটি সন্তান প্রসব করলেও একে গণেশজননী আখ্যা দেওয়া যায় না কিছুতেই। কাঁচা-কচি বয়েসের তুলনায় মেয়েটিকে অকালপক্ক বলেই মনে হল।

আটত্রিশ বছরের সেয়ানা জগদীশের সঙ্গে অভিজ্ঞতায়-বুদ্ধিতে কোনোদিকেই দাঁড়াতে পারে না সুষমা। জগদীশের ওপর রাগ হল। তার রুচি পালটেছে, কিন্তু এতদূর অধঃপতনের কল্পনা তিমির করেনি।

তিমির হাত তুলে নমস্কার করল সুষমাকে।

সুষমা স্মিত হেসে বললে, বসুন। চা নিয়ে আসি।

সে বেরিয়ে যেতেই জগদীশ বললে, কি রকম দেখলি বউকে?

তিমির ক্রোধ চেপে বললে, এর চেয়ে অন্য আশা আমি করিনি।

ভাবছি সমাজে গৌরীদান প্রথা আজো লোপ পায়নি। তোমার বয়েস কত হল জগদীশ?

জগদীশ গম্ভীর হয়ে বললে, বয়েস কি আর বৎসরের হিসেবে মেলে রে ব্রাদার। বয়েস হচ্ছে রক্তের জোব···

—তুমি কাওয়ার্ড··

হা হা কবে হেসে উঠল জগদীশ।—বিয়ে যখন করতেই হবে তখন একটি রমনী রত্নকেই করা উচিত নয় কি? এর মধ্যে সেন্টিমেন্ট নেই, প্রয়োজন আছে। তোমরা আজকালকার ছেলেরা যাই বল না কেন বাঙলা দেশের কুড়িতে বুড়ী একটি মেয়েকে বিয়ে করতে আমি কোনো মতেই রাজী নই।

তিমির বেগে বললে, ওই একচোখেই তোমবা মেয়েদের দেখতে শিখেছ—

জগদীশ আবার হাসল।—জীবন উপভোগেব জন্যেই। মেয়েদেব আমরা চিরকালই ভোগের জন্যে বিয়ে কবব। ভোগ কথায় তোমাদেব আপত্তি, বেশ এর নাম লভ-ই দাও না কেন। আসলে লক্ষ্যপথ একই। নিজের রসিকতায় হাসিতে ছত্রখান হয়ে পড়ল জগদীশ।

জগদীশের দিকে অবাক-বিহ্বলতায় চেয়ে রইল তিমিব। এ-জগদীশকে চিনতে তার কষ্ট হচ্ছে। অতীত জীবনের সমস্ত হিসাব-নিকাশ চুকিয়ে দিয়ে নতুন মোটা লাভের খাতায় নিজের জীবনকে খরচ করে দিয়েছে সে। জগদীশ জীবনে বেঁচে থাকাকেই সাব জেনেছে। ইনস্যুরেন্সের দালালি, ঘরে নিরুপদ্রব সর্বসহা নবীনা-স্ত্রী।

কিন্তু ··থাক জগদীশের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ।

জগদীশ বিড়ি টানতে টানতে বলে গেল কাজের কথা। ইনস্যুরেন্সের ব্যাপারে কি ভাবে তালিম দিতে হবে, কেমন করে বিরুদ্ধ মক্কেলকে শনৈঃ শনৈঃ হাত করতে হবে, কত পার্সেণ্ট কমিশন মিলবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাস্তায় নেমে হাঁপ ছেড়ে বাঁচল তিমির।

আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে। তরুণের ম্যাট্রিক পরীক্ষা শুরু হবে কাল থেকে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে বাড়িতে পা দিতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে এল সুলতা।

—দাদা, দাদা, বাবাকে কুকুরে কামড়েছে। সৌরেশবাবু ওঁকে হাসপাতালে নিয়ে গেছেন।

—এঁ্যা!

—চোখে ভালো দেখতে পাবেন না, তবু রোজ বিকেলে রামকৃষ্ণ মিশনে যাওয়া চাই। অন্ধকারে ভুল করে গলির মোড়ে কুকুরের গায়ে পা দিয়ে ফেলেছেন....

বাড়িতে আর থাকা চলল না। আবাব বেরিয়ে পড়ল তিমির।

কয়েকটি মাস গড়িয়ে গেল আপন গতিতে।

সৌরেশ আপিস থেকে ফিরল বোঝাই করা স্টেশনারী টুকিটাকি নিয়ে। মাস পয়লায় মাইনে পেয়ে মেজাজ দরাজ।

সুলতা হেসে বললে, সমস্ত দোকানটাই তুলে এনেছেন যে।

সৌরেশও হেসে জবাব দিল।—পারলে সমস্ত দোকানটাই তুলে এনে রাখতাম। আর তোমাকে দিতাম স্টোরকীপার করে।

—এ হল ফলের বাগানে পাখির পাহারা। চুরি করে দোকান উজাড় করে দিতাম।

—তাই নাকি? নাও ধর জিনিসগুলো। আমি কতক্ষণ ধর রে লক্ষ্মণ হয়ে দাঁড়াব।

সুলতা মুখ ভার করে বললে, সত্যি, আপনি বেজায় খরচে। আমার ভীষণ রাগ হয়।

সৌরেশ বললে, খরচ না করলে ভরবে কি করে? উপদেশ রাখ। এগুলো রেখে আমাব জন্যে এক কাপ চা করে নিয়ে এস। জলদি। আর তৈরি হয়ে নাও—সিনেমায় যাব।

সুলতা গম্ভীর গলায় বললে, না।

—কেন?

—এইভাবে এত খরচ করা আপনার উচিত নয়। আমরা গরিব, জানেন না আমাদের লোভ কত নীচে নামতে পারে।

সৌরেশ বললে, জীবনে যাদের লোভ নেই তারা হয় মিথ্যাবাদী নয় মনীষী। লোভ তো আমারও কম নয়, লতা। যাকে চাই তাকে দিয়েও যে ক্ষুধা মেটে না। আর তা ছাড়া—বেঁচে থাকতে হলে প্রয়োজনকে বাদ দেওয়া যায় না। আজ আমি দিতে পারছি, কিন্তু কাল যদি চাকরি খুইয়ে বেকার হয়ে বসি তাহলে কি আমাকে ফিরিয়ে দেবে?

সুলতা বাধা দিয়ে বললে, কক্ষনো অমন কথা বলতে পারবেন না। বলুন, আর বলবেন না।

সৌরেশ হেসে উঠল। মাথা নেড়ে বললে, বলব না।

সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত জীবনের একই বিস্তার। একই আনন্দ, একই দুঃখ—গাঁথা হয়ে আছে বাড়ির লোনা-ধরা চার দেয়ালের সঙ্গে। যেখানে মাথার ওপরে মরা মাছের চোখের মতো পাণ্ডাশে আকাশ, বাঁধা রোদ, বাঁধা হাওয়া। নিয়মিত রোজকার কাজগুলি চোখ বেঁধে অনায়াসে করা যায়।

প্রেক্ষাগৃহের আধো অন্ধকারের ঐন্দ্রজালিক স্পর্শে আর-এক নতুন জীবনের ফুল ফোটে। নতুন এক রোমাঞ্চ-থরথর মহাদেশ, আনন্দ-বেদনায় দীপ্র। রুপালী পর্দায় মানুষ হাসে, কাঁদে, ভালোবাসে, রাজা হয়, রাণী হয়। ওদের আনন্দে ওদের প্রেমে পাগলপারা সুলতা, ওদের দুঃখে চোখ অশ্রুমতী নদী।

ইংরেজী ছবি। একটি নির্জন করুণ-কন্যার কাহিনী। ওর নবীন যৌবনের অরক্ষিত দুর্গ জয় করতে পৃথিবী মেতেছে ডাকাতির সাজে। তাড়া খেয়ে হরিণীর মতো ছুটেছে কুমারী বন পাহাড় ভেঙে, পেছনে ছুটেছে লেলিহজিহ্ব ব্লাড-হাউণ্ডের ঝাঁক, অশ্বারোহী মানুষ। কোথায় পালাবে সে। ধরিত্রীর বুভুক্ষু গহ্বর টেনে নিল তাকে অন্ধকার পাতালের তলায়, একটা বিপুল আর্তনাদের প্রতিধ্বনি গমকে গমকে ছড়িয়ে পড়ল দূর থেকে দূরান্তরে। পশ্চিমাকাশে সূর্যের চিতা লেলিহান জ্বলে উঠল।

সৌরেশ বুঝিয়ে দিল ছবির বক্তব্য।

ছবি শেষ হল। আলো উঠল জ্বলে। তখনো পর্যন্ত থরথর করে কাঁপছে সুলতা। উত্তেজনায় ধড়ফড় করছে বুক, গলা শুকিয়ে কাঠ। বাইরে বেরিয়ে এসেও কোনো কথা সরল না ওর মুখ থেকে, না পারল সৌরেশের মুখের দিকে সাহস করে চাইতে।

পাশাপাশি হেঁটে চলল দুজনে।

সিগারেট ধরিয়ে সৌরেশ জিগ্যেস করল, চল চা খাবে?

সুলতা মাথা নাড়ল।—চলুন তাড়াতাড়ি। দেরি হয়ে গেছে।

খেতে বসে সৌদামিনী ফিসফিস করে জিগ্যেস করল, কেমন বুঝছিস?

—কিসের? মায়ের লোভাতুর কাঙালপনা যেন আগুন ধরিয়ে দেয় সারা গায়ে।

—মেয়ের ঢঙ দেখ। নিজের ভালো মন্দ কিছুই বুঝবে না। বিয়েটিয়ে করার কথা কিছু বলেছে সৌরেশ…

ভাতের গ্রাস আটকে গেল গলায়।—মা তুমি কি। ঘৃণায় লজ্জায় নিজেকে মিশিয়ে ফেলতে চাইল সুলতা।

রাত্রে ঘুমতে গিয়ে ঘুম আসে না। সারা সন্ধ্যার উত্তেজনায় বুকের ভেতরটা টনটন করছে। কেন ও-ছবি দেখাল সৌবেশ! ভয়াল-ভয়ংকর। কী বিশাল পৃথিবী, ধূ-ধূ করছে প্রান্তরের মতো· নির্জন নিঃসম্বল কুমারীর যৌবন-বেদনা। মানুষ এল শক্তির মদ পান করে, লোভের আগুন জ্বলে উঠল তার দু-চোখে। কোথায় পালাবে কুমারী। শক্তিমদমত্ত .মানুষ ভেঙে চুরমার করে দিয়ে গেল তার বাঁচার সম্বলকে।

মিইয়ে-দেয়া বাতিটা উস্‌কে দিয়ে আয়নায় নিজেব প্রতিবিম্বের দিকে তাকিয়ে রইল সুলতা।

সে কি ভুল করেছে! পৃথিবীকে ভালো করে বোঝবার আগেই নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে। সৌরেশ কি অমনি করেই একদিন তার সর্ব্বস্ব লুট করে নিয়ে বিশ্বের হাটে তাকে নগ্ন করে দেবে।

শরীর খারাপ ছিল রাত্তির থেকেই।

সকালে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছিল তিমির।

খবরটা ভগ্নদূতের মতো ঠোঁটে করে নিয়ে এল তপন।

—দাদা, ছোড়দা ফেল করেছে।

হাত থেকে বইটা নামিয়ে রেখে আশ্চর্য ব্যথায় ক্লিষ্টস্বরে বললে, তাই নাকি? ম্যাট্রিকের রেজাল্ট আউট হয়েছে?

সুলতা ছুটে এসে রোষভরে বললে, শুনেছ দাদা?

তিমির বললে, হুঁ...

—তুমি তো একটুও বকবে না ওদের! পড়াশুনা করলে কেউ ফেল করে!

—ফেল করেছে কি করা যাবে বল্? আবার পড়বে।

—তাহলেই হয়েছে। তুমিও তো একটু দেখিয়ে দিতে পার না।

সারা বাড়িটা আজকে একটা উত্তেজনার খোরাক পেয়ে জ্বলে উঠেছে। ও-ঘরে বাবার চিৎকার, মায়ের গজগজ। আর সকলের সমালোচনার জবাব দেবার দায়িত্ব বোধকরি একা তিমিরের ঘাড়ে পড়েছে। ঘটনাটায় অভাবনীয় কিছু নেই, পরীক্ষায় ফেল করা কিছু চমকপ্রদ খবর নয়। পাস-ফেল পরীক্ষায় আছে। কিন্তু, পরীক্ষা দিতে বসে পরীক্ষার্থী ফেল করবে কেন? কেন ফেল করবে যখন জানে তারা গরিব, বারবার ফেল করবার বড়লোকি-বিলাস তাদের শোভা পায় না।

সকাল গড়িয়ে দুপুর—দুপুর থেকে বিকেলে পৌঁছল। কিন্তু নাটকের মূল নায়ককেই পাওয়া গেল না। সকাল বেলা খবর শুনতে বেরিয়েছিল তরুণ, খবর শুনে আর বাড়িতে ফেরবার প্রেরণা পায়নি। সারাটা দুপুর ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিল এক বন্ধুর বাড়ি। যখন ঘুম ভাঙল বিকেল হয়েছে। বোবাধরা অনুভূতির আলোকে সমস্ত বিকেলটা কেমন নিরর্থক হয়ে উঠল তার কাছে। মামাদের দেশের পুকুরে নাইতে গিয়ে ছোটবেলায় ঢোঁড়া সাপ পায়ে কামড়ে ছিল, অনুভূতিটা ঠিক তেমনি। আরো কতক্ষণ ওইভাবে পড়ে থাকতে হত, বলা যায় না।

তপন ডাকতে এল।—দাদা বাড়ি চ···

তরুণ কাছে টেনে নিল ভাইকে।—বাড়িতে সব ফায়ার নাকি রে?

তপন বললে, জানি না।

—দাদা কি বললে রে?

—বললে আবার পড়তে।

তরুণ বললে, দেখ তো দাদা কত বোঝে। ফাস্টচান্সে যে-সব ছেলেরা নকল করে পাস করে তাদের আমি দুচক্ষে দেখতে পারিনে।

বাড়িতে পা দিতেই এক প্রস্থ গঞ্জনা শুরু হল। নির্বিকার হজম করে গুম হয়ে বসে রইল তরুণ। তার চোখের সামনে সমস্ত পৃথিবীটা মনে হচ্ছিল ধোঁয়া, মানুষের পাস-ফেল নেহাত-ই বাজে ব্যাপার।

সুলতা ঠোঁট বেকিয়ে বললে, কেমন লাগছে এখন? পাড়াব সব ছেলেরা পাস করে গেল আর তুই থাক বসে আর এক বছর।

তরুণ আর ধৈর্য বাখতে পারল না। চিৎকার করে বললে, তুই চুপ কর দিদি। কোনোদিন তো পড়াশুনা করলি নে। কি করে জানবি তুই। স্বয়ং বিদ্যাসাগব জন্মালেও এই বাড়ি থেকে পাস কবতে পারত না।

—মাগো! কী কথার ছিরি! অত বড় ধাড়ী ছেলে একটুও লজ্জা নেই। সুলতা ছুটে এল তিমিরের কাছে।—দাদা শুনেছ গুনধর ছেলের কথা। আমাকে বলে মুখ্যু, আমি কিছু জানিনে।

একে শরীর খারাপ তার উপর এই বিশ্রী চেঁচামেচিতে মাথা খারাপ হবার যোগাড় হল তিমিরের। রাগে কোলাহল করে উঠল শরীরের ভেতরটা।

—তরুণ, এই তরুণ···। নিজের বিকৃত উত্তপ্ত গলার ঝাঁজে নিজেই চমকে উঠল তিমির।

—কি বলছ ? তরুণ এসে দাঁড়াল সামনে।

—কেন অশান্তি করছিস, এঁ্যা ? কোথায় ছিলি সারাদিন ?

তরুণ যা-হক কিছু একটা উত্তর দিলেও বোধ হয় শান্ত হত তিমির। কিন্তু ওর এই নির্বাক শক্ত হয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গী আরো বেশি জ্বালিয়ে দিল তিমিরকে।

—কি, কথা বলছিস নে কেন! কি ভেবেছিস কি, এঁ্যা ? প্রাণপণ শক্তিতে ওর গালে এক চড় বসিয়ে দিল তিমির।

দাঁতে দাঁত এঁটে মরিয়া হয়ে দাঁড়িয়ে রইল তরুণ। দাদা ওকে একেবারে মেরে না ফেললে আর কিছুতেই নড়বে না।

কিন্তু, দাদা আর ওকে মারে না কেন! এই তো আর-এক গাল পেতে দিয়েছে সে। মারুক মারুক। দাদা, আমাকে মেরেই ফেল।

—দাঁড়িয়ে আছিস কেন। যা, যা এখান থেকে। তিমির চিৎকার করে উঠল।

তরুণ তেমনি ভাবেই বেরিয়ে গেল। ময়লা জামা, হাফপ্যাণ্ট, পায়ে ছেঁড়া বাটার চটি। এলোমেলো রুক্ষ চুল।

ঘুম নেই তিমিরের। অন্তর থেকে একটা 'ছি ছি' বেরিয়ে এসে তাকে যেন দাহ করতে লাগল। সতরো বছরের ছেলেকে এইভাবে মেরে শাস্তি দেয়া যায় না কিছুতেই।

রাত্রি বাড়ল।

মাঝে একবার প্রশ্ন করেছিল তিমির ঃ তরুণ ফিরেছে কিনা!

সুলতা বললে, ফেরেনি।

বাইরে ঘড়িতে দশটা বেজে গেল।

—তপু···তপন··। তিমির ডাকল।

—ওর বন্ধু বান্ধব কারুর বাড়িতেই ছোড়দা নেই···। তপন এসে জানাল।

উত্তপ্ত অতন্দ্র চোখের ওপর দিয়ে যেন আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত বয়ে যাচ্ছে।

অনেক রাত্রে তরুণ ফিরে এসে মুখ বুঁজে যখন বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়ল, স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ঘুমল তিমির।

ভোরবেলার দিকে হঠাৎ বিশ্রী স্বপ্নে ঘুম ভেঙে গেল তিমিরের।

স্বপ্ন নয়, সত্যি।

—দাদা, ও দাদা…সর্বনাশ হয়েছে…ওঠ ওঠ…। সুলতার গলা।

—কি রে?

—তরুণ…তরুণ …। কেঁদে ফেলল সুলতা।—তরুণ বিষ খেয়েছে।

—এঁ্যা!

তরুণের বিছানা ঘিরে মা-বাবা ভাই বোন ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। ছটফট করছে তরুণ উগ্র বিষের জ্বালায়। মুখ থেকে গেঁজলা বেরচ্ছে, অস্বাভাবিক লাল চোখ দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছে।

সৌরেশ গেছে ডাক্তার ডাকতে।

ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেল তরুণ।

মূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইল তিমির। কাকে মারতে গিয়েছিল সে! ওকে মেরে ওর কতটুকু ভালো করা যায়! জীবন আর মৃত্যুকে সে ছেলেখেলা মনে করেছে।

—সেন্টিমেন্টাল ফুল্…। বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল তিমির।

নিজে মরে গিয়ে কাউকে মেরে যায়নি তরুণ। বালিশের তলায় রেখে গেছে ওর জবানবন্দি ঃ তার মৃত্যুর জন্যে কেউ দায়ী নয়।

দিন কাটে।

প্রতিদিন একই অভিনয়, বেঁচে-থাকার, জীবনধারণের। সকালে উঠে ট্যুশনি, দুপুরে চাকরির-মৃগয়ায় আপিস-চত্বরে, সন্ধ্যেয় আবার ট্যুশনি। রাত্রে অবসন্ন হয়ে বাড়ি ফিরে-আসা।

তবু, এই নিয়মিত যন্ত্রের চাকা ঠেলে মাঝে মাঝে কোথা থেকে এক ব্যথা-বেদনা ক্ষয় করে ফেলে জীবন-সংগ্রামের তীব্রতাকে।

তরুণ…তরুণ আত্মহত্যা করেছে। সতরো বছরের জীবনেই যেন পৃথিবীর কাছ থেকে সব-পাওয়া তার পাওয়া হয়ে গেছে। অভিমানে লাথি মেরে চলে গেল সে বিদায় নিয়ে।

ওইটুকু একটা ছেলের মধ্যে এত আত্মাভিমান, এত বেপরোয়া দম্ভ এল কি করে। ফেল করেছিল তাতে কি হয়েছে। আবার না হয় পড়ত। অনেক ভালো ছেলেও তো ফেল করে। তারজন্যে না হয় একটু বকুনিই হয়েছে। তাতেই কাণ্ডজ্ঞানহীনের মতো সুইসাইড করতে হবে।

ওর মৃত্যু দিয়ে তিমিরকেই যেন শিক্ষা দিয়ে গেল সে। কিন্তু…

ব্যোমকেশের সঙ্গে আপিসে দেখা করতেই বললে, ইউরেকা। তোরই খোঁজ করছিলাম। শোন, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে ক্লার্ক নিচ্ছে। আজকেই দরখাস্ত করে দে। মাইনে কিন্তু খুব কম…আশী টাকা।

তিমিব নাকের ওপর থেকে ঝুলে-পড়া চুলটা সরিয়ে দিয়ে বললে, তা হোক। কি করে চাকরিটা পাওয়া যায় বল্ ?

ব্যোমকেশ বললে, এ-চাকরি তো তোরই হাতে। মনীষার বাবা শিবপ্রসাদ নন্দীই তো চেয়ারম্যান…

মনীষা। হঠাৎ স্মৃতির আকাশ থেকে একটা নক্ষত্র স্খলিত হয়ে পড়ল, আর সেই আলোতে দিশাহারা মানুষের মতো চোখ ধাঁধিয়ে উঠে কিছুক্ষণ স্তম্ভিত পঙ্গু করে দিল তিমিরকে। ছোটবেলায় মহানন্দায় স্নান করবার সময় দূরের থেকে ভেসে আসত বাসী পুজোর মালা, আর সেই বাসী মালার বাসী গন্ধ ছুঁড়োছুঁড়ি করে খেলা করতে সঙ্গীসাথীরা ভালোবাসত। তারপর স্রোতের টানে ভেসে-আসা মালাকেই আবার ভাসিয়ে দিত অন্য ঘাটে।

মনীষা। একটি আশ্চর্য নাম, আশ্চর্য মিলিয়ে-যাওয়া গন্ধ। মিলিয়ে যায় বলেই কি আশ্চর্য, নাকি আশ্চর্য বলেই মিলিয়ে যায়।

…কলেজ জীবনের স্মরণে-স্বর্ণ দিনগুলির বলিষ্ঠ স্বপ্ন। আকাশ তখন সমুদ্র-বিস্ময়, সবুজ ঘাসের শিষে তখন জীবন-জাগা মানে। আর মনে মনে খুশির বৈভব। ডিবেটিং সোসাইটির পাণ্ডা তিমির—খরশান ভাষা, গরুড়ের প্রথম-জাগা ক্ষুধার মতো সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে গিলে ফেলবার দুর্মর প্রতিজ্ঞা। আর ওর এই ষড়ৈশ্বর্য টেনেছিল মনীষাকে—ঝরনার মতো চঞ্চল, হাসিতে মাদকতা, চোখে মুখে সূর্য সম্ভোগের তপস্যা।

মনে পড়েঃ কলেজের সেবার এক কালচারাল ফাংসন। রবিঠাকুরের উপর তার বক্তব্য পেশ করে চুপ করে দাঁড়িয়ে ছিল প্যাণ্ডেল ছাড়িয়ে আধা অন্ধকারে চাঁপাগাছটির তলায়।

মনীষা দাঁড়িয়ে ছিল থার্ড ইয়ারের কয়েকজন মেয়ের সঙ্গে। এগিয়ে এসে মৃদু গলায় জানাল, কনগ্রাচুলেশন।

তিমির তখন ভাবের বাষ্পে ভরপুব। গম্ভীর হয়ে বললে, কিসের ?

—আপনার ভাষণ আমার ভালো লেগেছে।

হো হো করে অসভ্যের মতো হেসে উঠল তিমির। বললে, রবীন্দ্রনাথ আপনি পড়েছেন ?

তিমিরের কটাক্ষটা বেসুরো ঠাট্টার মতোই লেগেছিল মনীষার। মুহূর্তে ওর গৌরমুখ রক্তিম হয়ে উঠেছিল, কোনো জবাব দেয়নি। ধীর পায়ে চলে গিয়েছিল সে।

তারপর আরো দিন কেটেছে। সেদিনের বেসুরো ঝগড়াকে পাশ কাটিয়েই তারা কাজের টানে আবার এসেছে কাছে। সাংস্কৃতিক সম্পাদক সেবার তিমির, মনীষা মেয়েদের তরফ থেকে প্রতিনিধি। কাজ দিয়েছে ছন্দ, মন দিয়েছে মনোযোগ আর হৃদয় দিয়েছে সহানুভূতি। কাজের বাইরেও কত ছন্দ মিলাল তারা অকাজে,

মনীষাদের মোটর যাত্রায় কখনো গৌড়ের ধ্বংসস্তূপে, কখনো আদিনা মসজিদে। মনীষা চেয়েছে আকাশকে, তিমির ডেকেছে মর্ত্যকে। আর যেখানে তাদের মস্ত গরমিল, যে-হিসাবটা তারা এড়াতে গিয়ে লাফ দিয়ে পার হয়ে এসেছিল, কিছুদূর চলার পর সেই ফাঁকিটাই বড় করে ধরা পড়ল।

মনীষা একদিন হাই তুলে বললে, অঙ্ক করে জীবনে বাঁচা যায় না। তোমার মতো অঙ্কের মাস্টারের মন আমার নেই।

তিমির বললে, আমরা পদ্মভূক নই। জীবনে বেঁচে থাকাটা বিরাট গদ্য। আর সেই গদ্যের টাঁকশালে কেবল সম্রাটের মুখ খোদাই করা রয়েছে। সিরি-ফরহাদ কি লয়লা-মজনু কি রোমিও-জুলিয়েট নয়।

তিমিরেব মুঠো আলগা হল, আর ফাঁক পেয়ে মনীষাও তার স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেল। আবো রঙ চড়ল মনীষাব পালিশ করা মুখে, রঙবেরঙেব পোশাকের পালে ভর দিয়ে তাব দেহ-সাম্পান ভাসিয়ে দিল মনীষা, কাণ্ডারী রইল না কেউ। অনেক—অনেক গুজব শোনা গেল তার সম্পর্কে, ইংরেজী প্রফেসার সুখময়বাবুর নামের সঙ্গে জড়িয়ে।

তারপর পৃথিবীর আরো বয়েস বাড়ল, বঙ বদলাল, বর্ণ পাল্টাল। বি. এ. পাস করে কলেজ ছাড়ল তিমির, দু-বছর ফেল করে করে তারপর একদিন পশ্চিমে কোথায় তার এক মামার কাছে চলে গেল মনীষা। শুনেছে সেই মনীষা আবার ফিরে এসেছে, কিন্তু তার সম্বন্ধে বাড়তি কোনো কৌতূহল রাখেনি সে।

সেই একযুগ আগের কথা। যে-প্রশ্নকে একদিন ইচ্ছে করেই থামিয়ে দিয়েছিল নিজেই, আজ সেখানে কোনো অজুহাতেই উপস্থিত হওয়া চলে না।

ব্যোমকেশের কথায় চমক ফিরল।

—শুনেছি মেয়েটি নাকি আজো বিয়ে করেনি। নাচগান শিখেছে

ওস্তাদ রেখে। বড়-বড় [illegible] সঙ্গে যথেষ্ট দহরম মহরম....।
একটু থেমে আবার বললে, আমার কি মনে হয় জানিস তিমির, ওর এই অধঃপতনের জন্যে তুইই দায়ী।

হো হো করে পাকা অভিনেতার মতো হেসে উঠল তিমির। কোনো জবাব দিল না।

জীবনে আজো রোমান্সের গন্ধ দেখে ব্যোমকেশের মতো কেরানী-যুবকেরাই। কলেজ-জীবনের দায়িত্বহীন জীবনে অনেক মিষ্টি বকুলের গন্ধ মনকে উদাস করে দেয়, তাকে পরবর্তী জীবনে মনে-রাখার মতো হাস্যকর আর কিছু নেই। তিমির নামক যে-তরুণ ছাত্রকে একদিন মনীষার ভালো লেগেছিল, আজকের বেকার রুক্ষ তিমিরের মধ্যে তার কোনো প্রতিধ্বনি খুঁজে পাওয়া যাবে না।

তিমির গম্ভীর গলায় বললে, আজকে মনীষার কাছে গিয়ে কি কোনো কাজ পাওয়া যাবে ?

ব্যোমকেশ বললে, ট্রাই ইওর লাক্। নাথিং ইজ আনফেয়ার ইন লভ্ এণ্ড সার্ভিস...

সারা বিকেলটা মহানন্দার তীরে তৃণশয্যায় বসে কাটাল তিমির। পশ্চিম আকাশে সাহাপুরের মাথার ওপরে গাছেদের আড়ালে সূর্য ডুবে যাবার পর, মহানন্দার রুপালী জলরেখা সন্ধ্যার কালিতে লেপে পুঁছে একাকার হয়ে যাবার পরও যখন আকাশে একটি-দুটি তারা ফুটি ফুটি করছে, ওপারে মন্দিরেব কাঁসর ঘণ্টা, এপারে রামকৃষ্ণ মিশনের আরতির প্রস্তুতি, ভ্রমণকারী পথিকপায়ের মৃদুমন্দ গতি, ফিসফিস আলাপ আর হাসি, তখনো স্থির নিথর বসে রইল সে। তার চেতনা-লোক ডুবছে, অনুভূতি ভোঁতা হয়ে আসছে—সন্ধ্যার অন্ধকারে আপন অস্তিত্বটুকুও যেন লোপ পেয়ে গেল।

তারপর ঘুমঘুম আচ্ছন্নতা ভেঙে যখন সে উঠল মাথাটা অনেক পরিষ্কার হয়ে এসেছে। তারা-জ্বলা আকাশের মাথার ওপরে দেওদার গাছের চূড়োগুলো যেন তার ভাবনাগুলিকে একটা ধ্রুপদ গাম্ভীর্য

দিল। আর ঠিক সুমুখের আকাশের গর্ভে ছোট্ট তারাটি যেন অকূল পাথারে তাকে সঠিক পথ নির্দেশ করল।

নন্দীদের বিরাট তেতলা বাড়ি শহরের দক্ষিণ প্রান্তে। পেছনে পাওয়ার হাউস। সবুজ লন। টেনিস গ্রাউণ্ড বাঁ পাশে। মাঝখানে সরু সুরকির পথ ; থমকে থেমে গেছে গাড়িবারান্দার সামনে।

এগিয়ে গেল তিমির। দরজার গায়ে কলিং বেল। ইতস্তত করে কাঁপা হাতে কলিং বেলের বোতাম টিপে ধরল সে।

ভৃত্য এসে জিগ্যেস করল, কাকে চাই ?

—দিদিমনির সঙ্গে দেখা করব…। তিমির জড়ানো গলায় কোনো রকমে উত্তর করল।

—এখন তো দেখা হবে না। দিদিমনি নাচ করছেন।

এক মিনিট কি ভেবে তিমির বললে, আচ্ছা, তুমি গিয়ে আমার নাম বলবে ··তিমির পালিত।

ভৃত্য একটু অবাক হয়ে অন্দরে অদৃশ্য হল।

রুদ্ধশ্বাস কয়েকটা মিনিট দৌড়ে গেল।

ভৃত্য ফিরে এসে বললে, আসুন।

ড্রয়িংরুমে তিমিরকে বসিয়ে দিয়ে ভৃত্য চলে গেল।

মাথার ওপরে পূর্ণোদ্যমে পাখা ঘুরছে। পাখার ছন্দে সময়ও আবর্তিত হচ্ছে।

হঠাৎ কেমন কপালের শিরাটা দপ্‌দপ করে উঠল, চোখদুটো কেমন জ্বালা-জ্বালা করতে লাগল। আর সমস্ত অন্তরটা কেমন আহতবীর্য সিংহের মতো ম্রিয়মাণ হয়ে এল। কোথা থেকে একটা মশা এসে গুনগুন করতে লাগল তার নাকের সামনে। সাজানো-গোছানো ড্রয়িংরুম, তার ফ্রেস্কো কাজ-করা চার দেয়াল, ঝকঝকে টেবিল-চেয়ার সমস্ত কিছু মিলে যেন নৃত্য করতে শুরু করল তার চোখের সামনে। গলা শুকিয়ে কাগজের মতো খসখসে। আর বোবা-ধরা একটা

যন্ত্রণা যেন তাকে কুরে কুরে খেতে লাগল। হঠাৎ মনে হল না এলেই ভালো হত, যেন কাঁচা একটা নাটকের অঙ্কে অনাবশ্যক নিজেকে এনে হাজির করেছে, চরম নাটকীয় মনে হচ্ছে সমস্ত ব্যাপারটা। একবার মনে হল নিঃশব্দে পালিয়ে যায়, লন্ পেরিয়ে, গেট পেরিয়ে ছিটকে পড়ে খোলা রাস্তায়, আর পাওয়ার হাউসের দৈত্যটার মতোই ধকধক করে বাজতে থাকুক পলাতক হৃৎপিণ্ডটা।

কিন্তু···যাওয়া আর হল না। মিনিট কয়েক পরে পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে বৃষ্টির মতো ঝমঝম শব্দ তুলে পৌরানিক মলাট ভেঙে যেন নৃত্যপটিয়সী উর্বশীই নেমে এল মর্ত্যে। পরনে মেঘনীল শাড়ি, মানানসই ওড়না ঝুলছে পরিপুষ্ট বক্ষভারকে রক্ষা করে। দীর্ঘায়ত চোখে সুর্মা টেনেছে দীর্ঘ করে, আরক্ত অধর, কেশগুচ্ছে ঝুলছে জরির টুকরো।

মনীষা এক মুহূর্ত ঠোঁট চেপে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াল। এক পলকের গভীর আলোকে যেন তিমিরের অন্তস্তল পর্যন্ত ডুব দিয়ে এল সে। তারপর নিজেকে সংবরণ করে হেসে বললে, তুমি ! কি বলে অভিনন্দন জানাব ঃ আগমন না আবির্ভাব।

তিমিরের দৃষ্টি যেন ঘরের মেঝের সঙ্গে আটকে গেছে। আব দারুণ গুমটে যেন·তাব সমস্ত অন্তর ছেয়ে গেল। না পারল মুখ তুলতে না কথা কইতে।

মনীষাকে আরো প্রগল্ভা দেখাল।—তা অঙ্কেব মাস্টার, হঠাৎ কি মনে করে ? বারে ! কথা বলবে না বুঝি ? কথার সাগর তুমি বিদিত ভুবনে। খিল খিল করে হেসে উঠল সে।

পুরনো পরিচয়ের যে-সূত্র ধরে এখানে আসা, তিমিরের মনে হল, মনীষার আজকের জীবনে সে-পরিচয়ের কোনো দাম নেই। আগেই বোঝা উচিত ছিল মানুষের বয়েসের ইতিহাস তার মনোজগতের পরিবর্তনে। বদলেছে সমস্ত কিছু, আর মনটাই রূপান্তরিত হবে না, এটা ভাবাই ভুল।

তিমির হঠাৎ উঠে দাঁড়াল।

—একী! উঠছ কেন। বস—বস।

—না। আমি চলি…

—সে কি! কি জন্যে এসেছিলে, বললে না তো?

—না। তার আর দরকার হবে না।

—হবে—হবে। বস, বস বলছি। কতদিন পরে দেখা হঠাৎ চলে যেতে দিচ্ছে কে। একটু বসো, চলে যেও না। আমি জামা কাপড় ছেড়ে এক্ষুনি আসছি।

লঘু পায়ে বেরিয়ে গেল মনীষা।

আর ওকে বেরিয়ে যেতে দেখেই কেমন এক দুর্বলতা ধীরে ধীরে অবশ করে ফেলতে চাইল তাকে। মনীষার অস্তিত্ব তার কাছে কবে ফুরিয়ে গেছে। আজকের এই বিদেশী নতুন মনীষার কাছে কি করে চাকরির সুপারিশ প্রার্থনা করবে। ঝোঁকের মাথায় কাজটা করে ফেলেই অস্বস্তি লাগছে। এর চেয়ে এখানে না আসাই ভালো ছিল।

জামা কাপড় ছেড়ে নতুন বেশে এল মনীষা।

পেছনে বয়েব হাতে চা জলখাবারের ট্রে। টেবিলে রেখে দিয়ে বয় অন্তর্হিত হল।

চা তৈবি করতে করতে মনীষা বললে, তোমার পেয়ালায় যে আমি কোনোদিন চা ঢেলে দিতে পারব ভাবতেই পারিনি।

ওর কথার ইঙ্গিতে রক্তিম হয়ে উঠল তিমির।

মনীষা হঠাৎ অন্যমনস্কের সুরে বললে, কে জানে! হয়তো এই মুহূর্তেই পৃথিবীটা ভেঙেচুরে শেষ হয়ে যেতে পারে।

চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দিয়ে মনীষা বললে, খাও।

তিমির নীরবে পেয়ালায় চুমুক দিয়ে চলল।

কতগুলো মিনিট উতরে গেল।

তিমির ইতস্তত করে এবার বলে ফেলল, আমি কিন্তু তোমার কাছে একটা বিশেষ দরকারে এসেছিলাম মনীষা—

—দরকার। মনীষা হাসল।—তোমার কোন কাজে আমি লাগতে পারি, বল ?

—কাজটা ব্যক্তিগত। হয়তো তোমার ভালো লাগবে না…

—তাহলে বলে কাজ নেই। কাজের কথা আজ না হয় থাক তিমির। আজ শুধু গল্প কর, গল্প বল, পুরনো দিনেব গল্প। বল, কি করছ ? বাড়ির খবর কি ? বউ… ?

এক-এক করে সব গল্প বলে গেল তিমির। যা বলবার তার চেয়েও হয়তো রঙ চড়িয়ে বলে ফেলল। কারুণ্যের আভাস ছিল তার কণ্ঠস্বরে। শেষে বললে, বিয়ে করিনি।

—কেন ? মনীষার চোখে কুতূহল।

—অমনি। তিমির হাসল।

—হঠাৎ বৈরাগ্যের ভেক নিলে কেন ? মন না রাঙায়ে বসন রাঙালে যোগী।

—আমাব কথা ছেড়ে দাও। ও তুমি বুঝবে না। কিন্তু, তুমি একি করছ জীবনটাকে নিয়ে ? বিয়ে করনি কেন ?

মনীষা বললে, ওটা আমার খেয়াল। শক্তির পরীক্ষাও বলতে পার। দেহ-মনকে আমি আলাদা ভাগ কবতে পারিনে তিমির। মনকে বাদ দিয়ে দেহের যে বিবাহ তাতো কত লক্ষবাব করলাম। তাতল সৈকতে বারিবিন্দু সম—উদ্ধৃতিটা ভুল হল না তো ?

—এ সত্যিই ভীষণ অন্যায় মনীষা। এ ভাবে জীবনের বাজে খরচ……

—আমি দেবতা নই যে জীবনের বাজে খরচে ভয় পাব। আর ন্যায়-অন্যায়ের কথা ? জীবনে এ ন্যায়-অন্যায়ের বিচারক কে ? তুমিও নও, আমিও নই। জীবনে একটা ন্যায়কে বাঁচাতে গিয়ে কতগুলো অন্যায় যে মেয়েদের করতে হয়, তা তুমি বুঝতে পারবে না তিমির। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে মনীষা, যাকগে। সেই

পচা অতীতটা। বর্তমানেই ফিরে আসা যাক। বল, তোমার জন্যে কি করতে পারি ?

তিমির বললে, না থাক। আর একদিন বলব।

মনীষা বললে, তুমি আর কোনোদিন আসবে না জানি। আমি বলব-ও না যে তুমি এস। বল কি তোমার দরকার ?

তিমির মুখ নীচু করে ভাবতে লাগল। দেহ জোড়া ক্লান্তিতে নিজেকে আরো অবসন্ন লাগল। যেন কতদিন অসুখ ভোগের পর আজকেই হঠাৎ হেঁটে বেড়াবার ছাড়পত্র পেয়েছে। আর পারল না, আনত মুখেই কোনোরকমে বলে ফেলল।—আমাব হয়ে তোমার বাবাকে যদি একবার বল···শুনলাম ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে একজন কেরানী নেবে···

হঠাৎ বাজ পড়লেও এতখানি স্তম্ভিত হত না মনীষা। কিন্তু কয়েক মুহূর্তমাত্র। খিলখিল কবে ধারাল ছুরির মতো হেসে উঠল মনীষা। তাবপর হাসি থামিয়ে বললে, তোমার কথা বাবাকে বলব তিমির। আব দাঁড়াল না, ঝড়ের মতোই প্রচণ্ড গতিতে ঘর থেকে ছুটে পালাল সে।

—দিদি····খেতে দে···। তপন এসে হাঁক দিল রান্নাঘরে ঢুকে।

—দেখছিস না হাত-জোড়া। একটু বস্····

—হ্যাঁ। বসবে। আমার খিদে পায়নি বুঝি। সেই কখন খেয়েছি সকালে

—যা মাকে গিয়ে বল। আমি পারব না।

দুম দুম করে রোষভরে বেরিয়ে গেল তপন। উঠনের পেয়ারা গাছটায় দড়ি ঝুলছিল, সেটা গলায় ফাঁস লাগিয়ে ঝুলতে-ঝুলতে তপন চেঁচিয়ে বললে, দিদি, চললাম আমি ছোড়দার কাছে।

পিছন ফিরে ভাইয়ের কাণ্ড দেখে আতঙ্কে নীল হয়ে গেল

সুলতা। দ্রুত পায়ে ছুটে এসে ফাঁস থেকে আলগা করে দিল তপনকে।

তপন মুখ গোঁজ করে বললে, দেখবি। ঠিক একদিন এমনি করে ফাঁস লাগিয়ে আমি মরব। তোর জ্বালা আর সইতে হবে না।

হাত ধরে আদর করে তপনকে রান্নাঘরে নিয়ে এল সুলতা। উত্তেজনায় বেদনায় বুক ধড়ফড় করছে তখন। আদর করে আজ অবাধ্য ভাইটিকে বেশি করে খাইয়ে দিল।

—বল তপু—আমার গা ছুঁয়ে দিব্যি কর। আর কোনোদিন অমন কথা বলবি নে।

—কেন? বললে কি হয়?

—পাপ হয়। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সুলতা।

দিদির কান্না দেখে ভড়কে গেল তপন।—বারে! কি বোকা তুই দিদি! আমি তো ভয় দেখাচ্ছিলাম তোকে। আবার কাঁদে দেখ। বিশ্বাস কর দিদি—এই তোর পা ছুঁয়ে বলছি অমন কাজ আব কখনো করব না।

তপন খাওয়া চুকিয়ে উঠে গেলেও অনেকক্ষণ বোবার মতো বসে রইল সুলতা। কেন এমন হয়? আমার সব ভাইবোনগুলোই কি এমন পাগল হবে! তরুণ...একবারও ভাবল না বাড়ির কথা, দিদির প্রাণঢালা ভালোবাসাকে ঠেলে ফেলে দিয়ে চলে গেল সে। ওর ভালোর জন্যেই তো তাকে বকেছিলাম, তার শোধ কি এইভাবে নিতে হয় তার বোকা মুখ্যু দিদির ওপর।

জমাট ব্যথাকে আজ কান্নার লোনা স্বাদে ভরে তুলতে চাইল সুলতা।

কিন্তু...কতক্ষণ একনাগাড়ে কান্নার প্রবাহ বইয়ে দেওয়া চলে। চোখের জল মুছে ফেলল। চায়ের জল চাপিয়ে দিল উনুনে। সৌরেশ আপিস থেকে ফিরেছে।

—মুখ ভার কেন? কি হয়েছে? চায়ের কাপ হাতে টেনে নিয়ে সৌরেশ জিগ্যেস করল।

সুলতা ম্লান হেসে বললে, কিছু হয়নি।

সৌরেশ বললে, সারাদিন খেটে এসে তোমার ওই মুখ দেখতে আশা করি না মোটেই।

সুলতা বললে, আমি তো দেখতে খারাপ…

—ধর তাই যদি হয়, খারাপ মুখকে খারাপতর করবার কোনো মানে নেই। জীবনে প্রচুর দুঃখ কষ্ট আছে মানলাম, কিন্তু সে জন্যে অমন মুখ করে থাকার কি আছে। জীবনে আশা-আশ্বাস বলেও কি কিছু নেই লতা?

সুলতা মৃদু গলায় বললে, আছে। তুমি!

মেঘ-মেঘ আকাশ চিরে এক ঝলক সূর্যের আশীর্বাদ। সূর্য মুগ্ধতায় উদ্ভাসিত সুলতার চোখ মুখ। উজ্জ্বল অনাবৃত চোখে কি পরিপূর্ণ আত্মপ্রত্যয়।

তার দিকে বিমুগ্ধ উদ্‌গ্রীবতায় তাকিয়ে থেকে হঠাৎ কেমন সিরসির করে উঠল সৌরেশের সর্বশরীর। সুলতার মতো এমন নিরাভরণ নিরলঙ্কার ভাবে জীবনের পায়ে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে সঁপে দিতে তো সে কোনোদিনই পারবে না। জীবনের রাস্তায় পায়ে-পায়ে অনেক জঞ্জাল, সেগুলো এড়িয়ে চলা যায় কেবলমাত্র হৃদয় দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে নয়।

এক অদ্ভুত আনন্দে রোমাঞ্চিত সৌরেশ চিঠি লিখতে বসল তার প্রবাসী বন্ধুকে।

“প্রিয় শৈবাল, জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত ঠুনকো, হালকা। জীবন বস্তুটাকে কোনোদিনই গভীরভাবে গ্রহণ করিনি। পড়াশোনা করার একমাত্র লক্ষ্য ছিল কোনোরকমে নিজেকে এক বাঁধা মাসিক বরাদ্দের সীমায় বেঁধে ফেলা।

আমরা কত অল্পেই সন্তুষ্ট। অতীত কর্মের জন্যে কোনোদিন গ্লানি

বোধ করিনি, বর্তমান বা ভবিষ্যতের জন্যেও বিন্দুমাত্র নয়। তাই হাতের নাগালে যা পেয়েছি তাকেই শক্ত হাতে গ্রহণ করেছি, আবার প্রয়োজন শেষে নিষ্ঠুরের মতোই ফিরিয়ে দিতে পেরেছি। দৃষ্টি রেখেছি সামনে, পেছনে নয়।

আজ যখন নতুন করে বেঁচে থাকার কোনো মানে খুঁজে দেখতে যাচ্ছি, দেখছি হাত ময়লা হয়ে গেছে। এই ময়লা হাত দিয়ে কাকে স্পর্শ করব। আমার অশুচিতা, মালিন্য আজ আমাকেই যেন ঠাট্টা করছে। জীবনকে জীবন দিয়েই তো যুক্ত করতে হয়। কিন্তু যে নতুন জীবন—বিপুল আশা-আনন্দে রঙিন হয়ে আমার জীবনের বহু ব্যবহৃত ঘাটে ভিড়তে চাচ্ছে তাকে কি দিয়ে অভিনন্দন জানাব। কই সে জোর বুকেব মধ্যে, রক্তে কোথায় সেই নবজীবন বন্যার দোলা। দেহমনে এক বিদ্‌ঘুটে অবসাদ নিয়ে বসে রয়েছি।…”

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের চাকরিটা মনীষার কল্যাণে জুটে গেল তিমিবের।

প্রায় শ চারেক দবখাস্ত পড়েছিল ওই একটি কাজের জন্যে। কিছু এম. এ., বি. কম. পর্যন্ত ছিল। সকলের দাবি ঠেলে তিমিবই যোগ্য-প্রার্থী নির্বাচিত হল। কারণ ইণ্টারভিউ নিয়েছিলেন স্বয়ং চেয়ারম্যান সাহেব।

আপিসে সবে ঢুকেছে। এখনো বেকাবীর গন্ধ গা থেকে যায়নি। বড়বাবু মোটেই প্রীতির চক্ষে গ্রহণ করেননি তিমিরকে। বিরুদ্ধে কিছু বলতে সাহস পেতেন না কেবল ‘চেয়ারম্যানের লোক’ বলে। বড়বাবুর নিজেরই এক স্ত্রী সম্পর্কের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়ের জন্যে অনেকদিন থেকে এ-কাজটা ঠিক করে রেখে ছিলেন। হল না তিমিরের জন্যে।

তার এই ধৃষ্টতার জন্যে বড়বাবুর কাছে কম শাস্তি মিলত না। অন্য কেরানীদের টেবিল যখন খালি তখন কি করে তিমিরের টেবিলে জমে উঠত ফাইলের স্তূপ। আর বেশির ভাগই আজই-না-হলে-

নয় এমন কাজ। নিজে আসতেন আপিসে বেলা বারোটায়, কেরানীরাও তেমন এগারোটা সাড়ে এগারোটায় আসত। হাজিরা খাতায় লিখত দশটা। নতুন নতুন অতটা করতে পারত না তিমির। প্রথম দুদিন আপিসে হাজির হয়েছিল দশটায়। তখনো গেট বন্ধ। দরোয়ান পিওন কারুরই টিকি দেখার যো নেই।

সহকর্মী বিনয় পরামর্শ দিয়েছিল।—নতুন কিছু করতে যাবেন না দাদা। যস্মিন দেশে যদাচারঃ। এগারোটায় এসে নির্বিকার চিত্তে দশটায় সই করে দেবেন।

নতুন আবিষ্কারের যেটুকু আনন্দ একদিন তা মিলিয়ে গেল যথারীতি। রোজকার ছকে ফেলা নিশ্চিন্ত জীবনেব রূপায়ণে স্থির হল জীবনের ধারা।

মাস পয়লায় মাইনে নিয়ে আপিস থেকে রাস্তায় পা দিতেই মনটা অনেক উদার আর দার্শনিক সুলভ হয়ে উঠল।

বিজলী বাতিগুলি সবে জ্বলে উঠেছে। দোকান হোটেল রেস্তোরাঁ নৈশ অভিসাবে চটুল নারীর মতো মদালসা। নিওনের তরল-তরঙ্গ কাঁপছে তন্বী যৌবনের লীলায়।

বাস্তায় মন্দগতি জনোচ্ছাস। হাসি গান রঙ। জীবনের একটি দিনের উৎসব। কেরানী-জীবনের মাস পয়লা। দ্বিতীয় দিন থেকে তেমনি চায়ের দোকানে চলবে চা-পান-সিগাবেটের ধার। মুদিখানায় বাকি, গয়লার দুধের বাকি। হঠাৎ এক ছুটির দিনে প্রথম হপ্তায় সিনেমা-বিলাস।

রেস্তোরাঁয় ঢুকে এক কাপ চা খাবে কিনা ভাবতে ভাবতে চা খাওয়া হল না তিমিরের। পকেটে খামে ধরে-রাখা নোটগুলির মধ্যে এক নরম স্নেহশীল ভাবালুতা রয়েছে।

হাঁটতে হাঁটতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। পা দুটো কখন তাকে মনীষাদের বাড়ির সামনে এনে হাজির করেছে। কিন্তু, কেন? রাত-কানা মাছিদের মতো একী চংক্রমণ। কনগ্রাচুলেশন। কৃতজ্ঞতা।

কি হবে শস্তা কৃতজ্ঞতার বাণী শুনিয়ে। হি হি করে হয়তো হিষ্টিরিয়া-গ্রস্তের মতো উচ্চরোলে হেসে উঠবে মনীষা। সে-হাসির তোড়ে বন্যার কুটোর মতো লজ্জায় দীনতায় ভেসে যাবে তিমির।

গেট পেরিয়ে দরোয়ান রাস্তায় আসছিল, জিগ্যেস করল, কাকে চাই।

—দিদিমনি আছেন ?

—বোস সাহেব আছেন। এখন দেখা হবে না।

—ও…আচ্ছা।

ভুলে গিয়েছিল তিমির, মনীষার জীবনে আজ বোস সাহেবরা আছেন। পালিয়ে গিয়ে যেন বাঁচল সে।

সন্ধ্যার নির্জনতায় একটা গোপন নিশ্বাস মিশে গেল আকাশে বাতাসে।

রাত্রে খেতে বসে আর-এক বিচিত্র অনুভূতি।

এতক্ষণ সৌদামিনীর জেগে-থাকার কথা নয়। আজ তিমির খেতে বসতেই ঘর থেকে চেঁচিয়ে বললেন, খুকি, বাটির দুধটুকু খোকাকে দিস।

দুধের রঙ শাদা। এ-বাড়িতে জন্মে মায়ের স্তন ছাড়বার পর দুধের গন্ধ নাকে লাগেনি তিমিরের। বোধহয় স্বাদটাও ভুলে গেছে।

বিস্ময়ে কৌতুকে সুলতাকে জিগ্যেস করল, ব্যাপার কি ? আজ আবার দুধ কেন—হ্যাঁরে ?

সুলতা বললে, বাবার হুকুম। রোজ একপো দুধ বরাদ্দ হয়েছে তোমার জন্যে। আপিসের খাটনির পর ডাল-ভাত গিলে কি আর শরীর টেঁকে…

তিমির বিরক্ত হয়ে বললে, যত সব বাড়াবাড়ি। দুধ রেখে দে—

—আমি বাপু পারব না। মা মেরেই ফেলবে তাহলে…। সুলতা হেসে বললে।

—তোরা আমাকে পাগল না করে ছাড়বি নে। কোথায় শুনেছিস কেরানীরা এক পো দুধের জন্যে শুকিয়ে মরে যাচ্ছে। দুধ খাবারই যদি বরাত করব তাহলে আর কলম পিশতে যাব কোন দুঃখে, তাই বল্‌ ?

মধ্যবিত্ত সংসারের ভিড়ে মানুষ। অবহেলিত অবজ্ঞাত শৈশব কৈশোর, অসম্মানিত ধিক্কৃত যৌবন। নিজের জন্মগ্রহণের তারিখটিকে কোনোদিন শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেনি। নিজের জন্যে একটু নিভৃত কোণ ছাড়া সংসারের কাছে দাবি করেনি কিছু। বেঁচে থাকার মতো বস্তুটিই এক দুস্তর লজ্জা, এই লজ্জা বড় বয়েসের জিজ্ঞাসার সঙ্গেও জড়িয়ে গিয়ে তাকে যেন আরো হীনমন্য, কমজোরি করে দিয়েছে। যা না পেয়ে অভ্যেস হয়ে গেছে আজ তা মুঠোমুঠো করে ভরে দিলেও গ্রহণের স্পৃহা থাকে না।

সুলতা বললে, আমি মাকে আগেই বলেছিলাম। দাদা দুধ ছোঁবে না কিছুতেই।...লক্ষ্মী দাদা, আজকের মতো খেয়ে ফেল।

দুধের স্বাদ যেন পাঁচনের মতো। এক চুমুকে নিঃশেষ করে ফেলল তিমির।

সকালে ঘুম ভাঙল এক উজ্জ্বল স্বপ্নের অঞ্জন মেখে। অনেকদিনের গুমট বন্দী মনটা হঠাৎ দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে তীব্র খুশিতে ঝলমল করে উঠল।

বিছানা ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করে না। পায়ের কাছে বিছানার পর এক টুকরো চাঁপা রঙের রোদ্দুর এসে থমকে পড়েছে। জানলার বাইরে নীল আকাশ। নীল...নীল...নীল। নীলের পারাবার। বাঙলা দেশের নিজস্ব রঙ। পাঁজা পাঁজা মেঘগুলি যেন আমাদের স্বপ্নের প্রতীক।

সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সময়গুলি ঠাস বুনন। সকালে ট্যুশনি, আপিস, সন্ধ্যেয় আবার ট্যুশনি। টাকার প্রয়োজন যতই

দ্বিগুণিত হয়েছে, যুঝবার ঝোঁকটাও তেমনি তীব্রতর রূপ নিচ্ছে। বাঁচতে হবে সকলের জন্যে। স্বপ্ন ছিল সুন্দর সমৃদ্ধ জীবন-গঠনের। সেই স্বপ্ন আজো যৌবনের প্রেমের মতো তাকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু…এই সামান্য টাকায় কতদিন চলে। বৈশাখের লেহি লেহি ক্ষুধা এক মুহূর্তে গণ্ডুষে পান করে ফেলছে।

টাকা চাই। অনেক—অনেক টাকা। বাড়ির চার দেয়ালে চাপা স্বর ঃ টাকা চাই—টাকা চাই।

চণ্ডীচরণ আত্মপ্রসাদে ভারি হয়ে বলেন, ছেলেটা একেবারে পাগল!

সৌদামিনী উত্তর দেন, বেটাছেলে রোজগার না করলে কি মানায়। ছেলেটার যে মতিগতি ফিরেছে সেইটেই সুখের কথা।

অবাক চোখে তিমিরের দিকে চেয়ে থাকেন দুজনে।

সারাদিন যেন দম-দেয়া লাটিমের মতো ঘুরছে। ক্লান্তি নেই, শ্রান্তি নেই। বাড়িতে যেটুকু সময় থাকে নিতান্ত প্রয়োজনে, কথা বলে খুব কম।

নিজের পরিবর্তনে নিজেই বিস্মিত তিমির। আপন রক্তের মধ্যে খাটবার যে এত উৎফুল্ল-উৎসাহ লুকিয়ে ছিল, কোনোদিন ভাবতেও পারেনি। পরিপূর্ণ একটা এঞ্জিনই যেন দামাল গতিতে চালিয়ে যাচ্ছে তাকে। পৃথিবীতে যে-লোক কাজ করে তার কাজের অভাব হয় না, পরিশ্রমে তার কুঁড়েমি নেই। অবসরে বুড়িয়ে-যাওয়া মানুষ কাজের ভয়ে ক্রমাগত আলস্যের হাই তুলতে থাকে।

অকাল-প্রৌঢ়ত্বের দেউলেপনায় চণ্ডীচরণ যে-সংসারটিকে একেবারে নিলামে খুইয়ে দিতে বসেছেন তিমিরের জেদ তাকেই আবার লিজ্ দিয়ে বাঁচিয়ে তুলবে। নতুন-নতুন পরিকল্পনা গড়ে, ছক কাটে, হিসাব করে। অঙ্ক করে যে-সমাধানটা মেলে কেন যে তাকে বাস্তবে রূপ দেয়া যাবে না, বুঝতে পারে না কিছুতেই। মোটামুটি শ তিনেক

টাকা রোজগার করতে পারলে থেমে-পড়া সংসারটায় আবার স্রোত জাগতে পারে। আপিস আর ট্যুশনি বাদ দিয়ে আরো শ দুয়েক টাকা এদিক-সেদিক করে আনতে হবে। বাড়িতে কিছু ছেলেমেয়ে নিয়ে কোচিং ক্লাস খোলা যায় সপ্তাহে দুদিন—শনিবার-রবিবার। কিংবা জগদীশের মারফত ইনস্যুরেন্সের কাজটা চালিয়েও দেখা যেতে পারে।

নতুন করে নতুন নেশায় জীবনের সঙ্গে প্রেমে পড়ে গেল তিমির।

একদিন সহকর্মী বিনয়ের কাছে তার জীবনের পরিকল্পনা শোনাতে গেলে ধৈর্য ও মনোযোগে সে শুনল তিমিরের কথা। তারপর টেবিলে হাত রেখে গাঢ় স্বরে বললে, একদিন আপনার মতো আমিও ভেবেছিলাম তিমিরবাবু। ভেবে ভুল করেছিলাম। অঙ্ক করে ছক কেটে জীবনে বাঁচা যায় না। তারপর বাইরের বাস্তব পৃথিবীটার কাছে দিনের পর দিন ল্যাজমলা খেয়ে বোঝাই গাড়ির জোয়াল ভেঙে একদিন হুড়মুড় করে পড়লাম পথের মাঝখানে। রবিঠাকুরের ভাষা ধার করে অগত্যা নিজেকে প্রবোধ দিলাম ঃ কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি। (চুপি-চুপি বলি আপনাকে ঃ আমি এককালে ভালো রবীন্দ্র-সঙ্গীত গাইতে পারতাম।)

বিনয়ের আবেগের মুখে বোবা পাথরের মতো স্তব্ধ অচঞ্চল বসে রইল তিমির।

বিনয়ের গলার স্বর আবার শোনা গেল।—ব্যক্তিগত শুভবুদ্ধি দিয়ে সমাজের রঙ পালটায় না তিমিরবাবু। ওটা সলতের মতোই নিজেকে জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়। তবু, মানুষের জীবনের ট্রাজিডিই এই ঃ সে তবু স্বপ্ন দেখে রোমান্টিক চোখে, স্বপ্ন ভাঙে, যুগের পর যুগ মানুষের একই রোমান্টিক সফর।

—কিন্তু···। কি বলতে গিয়ে মূক হয়ে যায় তিমির। বিনয়ের দৃষ্টিভঙ্গীকে সে স্বীকার করে না। জীবনকে ভালোবাসলে জীবন

কখনো প্রতারণা করে না। জীবনের রঙ্গভূমিতে নেমে পড়েছে সে, ফেরবার উপায় নেই। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

বিনয় আপন মনে হো হো করে হেসে উঠল। হাত নেড়ে নাকের সামনে থেকে যেন একটা বিরক্তিকর মাছিকে তাড়াতে চাইল। তারপর বললে, কি হলাম শেষ পর্যন্ত? নব্বুই টাকার কেরানী। জীবনটা হয়েছে কণ্ট্রোলের কাপড়ের মতো, একদিক ভদ্রস্থ করতে গিয়ে অপর প্রান্ত দাঁত বার করে হাসে। একটু থেমে উপসংহার টানল কথার। —বুঝলেন তিমিরবাবু, আমরা মার কাছে বলিপ্রদত্ত। এ-যুগটা হচ্ছে স্যাকরিফাইসের। আমাদের জেনারেশনকে বোধহয় এইভাবেই শহীদ হতে হবে। উপায় নেই।

সারাদিনের অসহ্য গুমট আবহাওয়ার পর অনেক রাত্রে বজ্রবিদ্যুতের হুহুংকারে মুষলধারে বৃষ্টি নামল।

ঘুম ভেঙে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল সুলতা। জানলা গলে বৃষ্টির ফোঁটা আছড়ে পড়েছে ঘরের মেঝেতে। জলে জলাশয় সৃষ্টি হয়েছে।

জানলা বন্ধ করতে এসে হঠাৎ বাইরের কালি-ঢালা প্রেতায়িত রাত্রির বুক-কাঁপা গুরুগুরু শব্দে স্তব্ধ সমাহিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সে। চুল ভিজে যাচ্ছে, জামা-কাপড় ভিজে যাচ্ছে—খেয়াল নেই। বৃষ্টি-ভেজা কদম্ব-কেশরের মতো তার দেহমূল থরথর করে কেঁপে উঠল।

জানলাটা বন্ধ করে দিয়ে দরজা খুলে ভেতর দিকের বারান্দায় এসে দাঁড়াল।

সমস্ত বাড়িটা নিস্তব্ধ। কোথাও কোনো জাগরণের সাড়া নেই।

কেবল বৃষ্টির একঘেয়ে আর্তনাদ। একটা আহত জন্তু যেন চিৎকার করছে।

অনেকক্ষণ থমথমে অন্ধকারের দিকে চেয়ে স্থির হয়ে রইল সুলতা।

হঠাৎ মনে হল সৌরেশের ঘরের জানলাগুলি বোধহয় খোলাই রয়ে গেছে। যা ঘুমকাতুরে লোক। উঠে গিয়ে জানলা বন্ধ করবারও উৎসাহ থাকবে না। হয়তো মশারি-বিছানা সব ভিজে একশা হয়ে গেছে এতক্ষণে।

পায়ে পায়ে এগল ঘরের দিকে। ভেজানো দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল। অন্ধকার। মাথার দিকেব জানলাটা, যা ভেবেছিল তাই, খোলাই বয়েছে।

জানলা বন্ধ করে দিয়ে সৌবেশের বিছানার পাশ দিয়ে নিঃশব্দে চলে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল সুলতা। এক রাশ নিষিদ্ধ কুতূহল, দুর্নিবাব লোভ তাব বুকের বক্তে ছলাৎ ছলাৎ কবতে শুরু কবে। ঘন ঘন নিশ্বাস পতনে নাকেব পাতা ফুলে ফুলে উঠছে, সমস্ত শরীর জুড়ে কেমন এক নিরবয়ব অবসাদ। কেমন করে একটা মানুষ অচেতন হয়ে ঘুমিয়ে থাকে গভীর বাত্রে। মৃদু নিশ্বাস-প্রশ্বাস শোনা যাচ্ছে। দম বন্ধ কবে ঠোঁট কামড়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা কবে সুলতা। তাবপব ফিবে পা বাড়াতেই হঠাৎ একজোড়া সবল বাহু অন্ধকাবে বুকের ওপব টেনে নিল তাকে। ঘন ঘন ওব মুখে চোখে ঠোঁটে চুম্বন কবতে করতে আবেগ ঘন গলায ফিসফিস কবে বললে সৌবেশ, জানতাম তুমি আসবেই।

শীতকালে খালি পায়ে বরফেব উপর দিয়ে হেঁটে গেলে যেমন লাগে তেমনি হিম-হিম অবশাঙ্গ সুলতাব। সর্বগ্রাসী চেতনাহরণকারী গাঢ তমিস্রা যেন তিলে তিলে গ্রাস কবে তলিয়ে দিতে চাইল তাকে। ছোটবেলায় একবাব গ্রামেব পুকুরে এক গলা জলে ডুবে মরবার সময় যেমন অনুভূতি হয়েছিল।

নিজেকে গুটিয়ে নিয়ে কান্না-ভেজা গলায় ককিয়ে উঠল সুলতা। —আপনার পায়ে পড়ি, ছেড়ে দিন, ছেড়ে দিন আমাকে।

সৌরেশের সারা দেহে তখন শক্তির জোয়ার। যে-জোয়ারের তোড়ে তৃণখণ্ডের মতোই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে সুলতাকে।

বাইরে প্রকৃতির তাণ্ডব নৃত্য। ঘন ঘন বিদ্যুত-কটাক্ষ, আর মেঘের ডম্বরু।

সুলতার দেহ জুড়ে কামনার মৌমাছির মতো গুঞ্জন করছে সৌরেশের রক্তের সুর। ওর দেহের যজ্ঞশালায় যেন সোচ্চার মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করেছে সৌরেশ। সে-মন্ত্র বলছে: ওঠ জাগ। জড়তার পাঁক থেকে মাথা তোল, পদ্মের মতো শতদলে বিকশিত হও। সে-মন্ত্রের ধমকে বেতসের মতো কাঁপছে সুলতার দেহবল্লরী, হাওয়া-ভরা পালের মতো বিস্ফারিত হচ্ছে বক্ষদেশ, কাজল রাত্রির নক্ষত্রের মতো জ্বলে উঠছে চোখ।

—লতা…লতা…। তান্ত্রিক সাধকের মতো বিড়বিড় করে চলেছে সৌরেশ।

সুলতা মূক। প্রাণপণে দাঁতে দাঁত এঁটে শক্ত হয়ে রয়েছে। কিছুতেই কথা বলবে না। চেতনাবিহীন অস্ফুট আর-এক দেশে যেন চলে গেছে। যেখানে শরীরে খেদ নেই, ক্লান্তি নেই।

সৌরেশের শরীর যেন কথা কইতে পারে। ওর হাত দুটো যেন মুখর ভাষা। আর, আর…

—ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে…। আবার আর্তনাদ করে উঠল সুলতা।

সৌরেশের বালিশের ওপর ছটফট করতে থাকে ওর যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট দেহের ইচ্ছা। বেঁচে থাকার সমস্ত কামনাগুলি যেন শীতের পাতার মতো ঝরঝর করে ঝরে পড়তে থাকে।

বাইরে বর্ষণের মাদকতা পাগল করে দিয়েছে সৌরেশকে। একদিকে পৃথিবী আর আদি পুরুষ। নির্জন রাত্রি আর কুমারী-শরীরের ভীরুতা।

—লতা…লতা…

—না না। ছেড়ে দাও—তোমার পায়ে পড়ি—ছেড়ে দাও আমাকে—।

সৌরেশের ক্ষুধার্ত চোখের দিকে আর চাইতে পারে না সুলতা। সমস্ত দেহটা ওর রাত্রির অন্ধকারে কঠিন পুরুষ হয়ে উঠেছে। ভয়ে চোখ বুজল সুলতা।

বৃষ্টি থেমে যাবার পর সৌরেশের আলিঙ্গন আলগা হয়ে গেলেও মড়ার মতো নিঃসাড়ে পড়ে রইল সুলতা। আ-কোমর ক্লান্তি, ভীষণ ঘুম পাচ্ছে তার। একটি রাত্রির অভিজ্ঞতা যেন তাকে অনেক প্রাচীন, প্রবীণ করে তুলেছে।

পাশে শুয়ে সৌরেশ তখনো নরম হাতে ওর এলোমেলো চুলে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, মুখে চোখে আদরের স্পর্শ করছে। ফ্যালফ্যাল করে মানুষটার দিকে চেয়ে থাকে সে। চিনতে পারে না। হঠাৎ কেউ তার ঘবে টাঙিয়ে-রাখা সুন্দব ছবিটার ওপর কালি দিয়ে হিজি-বিজি করে দিয়েছে। মনের নিভৃত প্রদেশে বুকেব আচলের আড়ালে যে-প্রেমের দীপটিকে জ্বালিয়ে বেখেছিল, বর্বব লোমশ হাতে কে নিবিয়ে দিল সে-দীপটিকে। কালো বিশ্রী অন্ধকাবে সুলতার আকাশ হাবিয়ে গেল।

এবার এই অবিশ্বাস নিয়ে কি করে বাঁচবে সে। জীবনের প্রথম ভালোবাসা প্রথম ঘৃণায় পরিণত হল।

—লতা···এই····

কেন ডাক অমন করে। বল, আর কি চাও, আর কি নেবে লুঠ করে।

—লতা···বাগ করেছ ?

পরিশ্রান্ত শরীরে উঠে দাঁড়াল সুলতা। পরনের বিস্রস্ত শাড়িটা সর্বাঙ্গে জড়িয়ে নিল, তারপর মাতালের মতো বেপথু চরণে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

উঃ মুক্তি। বর্ষণক্ষান্ত তারা-উজ্জ্বল আকাশ। জলো হাওয়া

দিচ্ছে, দূরে কোথাও বৃষ্টি হচ্ছে বুঝি। টুপটাপ গাছের পাতা থেকে জল ঝরে পড়ছে।

ঘরে ফিরে এসে ধপ করে বিছানার ওপর বসে পড়ল।

ঘুম নেই চোখে। সুলতা কি কাঁদবে। না, ওর চোখে বিন্দুমাত্র অশ্রুর আভাস নেই। হঠাৎ আঘাত খেয়ে চেতনার রাজ্য ধ্বসে গেছে। তার জীবনের ওপর দিয়ে এই রাত্রে ভীষণ ডাকাতি হয়ে গেছে।

অন্ধকার···

জগদীশ হা হা করে কাষ্ঠ হাসি হেসে বললে, মাথার সৃষ্টি হয়েছে শরীরের ব্যালান্স রাখার জন্যে। ভেবে ভেবে মাথা খরচ করা ছাড়া কোনো লাভ নেই। ভাবনা জিনিসটা মাথার এক ধরনের পোকা ছাড়া কিছু নয়। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, কাজ করে যেতে। চোখ বুজে কাজ করে যা—মা ফলেষু কদাচন।

তিমির শীর্ণ হাসি টেনে বললে, চোখ বুজে তো কাজ করা যায় না জগদীশ, মুশকিল এইটেই যে চোখ খুলে কাজ করতে হয়।

জগদীশ বললে, তাহলে শিবনেত্র হ। ত্রিকালজ্ঞ হবার ভান করে বসে থাক! আর একটা কাজ কর—বিয়ে করে ফেল।

—ঠাট্টা করছ জগদীশ!

—ঠাট্টা নয় ব্রাদার। সংসারের আসল ঠাট্টা থেকে পালিয়ে বাঁচবার জন্যে লোকে যেমন তাড়ি খায়, মদ খায়···তেমনি দরকার মেয়েমানুষের। জীবনটা তো মহাকালের ক্ষণিক লীলা ছাড়া কিছু নয় ব্রাদার। ইট ড্রিঙ্ক এণ্ড বি মেরি ফর টু-মরো উই শ্যাল ডাই।

জগদীশের কথায় রাগের চেয়ে দুঃখই বেশি হয়। তাই কি সংসার দাবদাহ জুড়বার জন্যেই সে তেরো বছরের খুকীকে বিয়ে করেছে।

—তা না হলে এক কাজ কর—জগদীশ আবার বললে, দেখেশুনে এক ধনী কন্যার প্রেমে পড়। তোদের হাল ফ্যাশানের আদর্শও বজায় থাকবে মোটা লাভও হবে।

গোধূলি সূর্যাস্তের রঙে এক মুহূর্তকাল মনীষার মুখচ্ছবি ভেসে উঠল।

জগদীশ থেমে বললে, কমপ্লেক্সে বাধবে মেয়েদের উপরে খেতে। কিন্তু কেন শুনি? সংসার আশ্রমটা যখন দুজনেরই তখন মেয়েদের বেলায় এ-পক্ষপাতিত্ব কেন রে বাপু?

তিমির চুপ করে শোনবার চেষ্টা করছিল ওর মন্তব্য। জগদীশ জীবনের কারবারে কখনোই সিরিয়াস নয়। কিন্তু তবু একেবারে নস্যাৎ করে দেয়া যায় না তাকে। সে যেন শেক্সপীয়ার-নাটকের ক্লাউন।

জগদীশের কাছে টাকা ধার করতে এসে এত কথা শোনবার ইচ্ছে না থাকলেও মনোযোগ দিয়ে শুনতে হল।

—বল, কতটাকা চাই? দেরাজ খুলতে-খুলতে বললে জগদীশ। —আমার আবার একটু তাড়া আছে।

—গোটা তিরিশেক দিলেই চলবে আমার। তিমির নিচু গলায় পেশ করলে কোনোরকমে।

টাকাটা পকেটে পুরে বেরিয়ে এল সে।

নিজের প্রতিবিম্ব দেখে নিজেকেই যেন চিনতে পারে না তিমির। আমূল জীবনের চেহারাটা যেন কেমন দ্রুত পালটে যাচ্ছে। যেন আরো দশজন মানুষের মতোই সাধারণ আটপৌরে হয়ে পড়ছে। বেঁচে থাকা এক দুর্ধর্ষ জীবন জ্বালা। না-বেঁচে-থাকা আরো কঠিন। বাবা এক কালে নিয়মিত ধার করতেন। মক্কেল দোকানদার আত্মীয়-স্বজন কেউ বাকি ছিল না। আজকাল আর লোকে ধার দেয় না। বাবার পরিত্যক্ত ভূমিকা গ্রহণ করেছে তিমির। মধ্যবিত্ত জীবনের

পুরনো নাটক। একটি স্থায়ী চাকরির কল্যাণে আজো ধারের বাজারে বদনাম হয়নি তার। ছোটখাটো আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সংসারকে টিকিয়ে রাখাটাও যেন এক বিশেষ কায়দা। সার্কাসে দড়ির ওপর নেচে-যাওয়া ওস্তাদের মতো।

তিমিরই আজ হেড অব দি ফ্যামিলি। সুযোগ্য পুত্রের উপর সমস্ত ভার দিয়ে সংসার আশ্রমে থেকেও বানপ্রস্থ নিয়েছেন চণ্ডীচরণ।

জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের দায়িত্ব একা তারই। যতক্ষণ বাইরে থাকে অনেক নিশ্চিন্ত, বাড়িতে পা দেবা মাত্রই সাঁড়াশির মতো সংসারটা যেন চেপে ধরে। বলে : দাও—দাও। আরো দাও। মৈ ভুখা হুঁ।

—দাদা, আমি আর ইস্কুলে যেতে পারব না। তপন রোষভরে এসে দাঁড়াল।

এক ফোঁটা ছেলেটার ন্যাকাস্বর শুনে সমস্ত রক্ত জ্বলে ওঠে। তবু নিজেকে সংযত করে শান্ত গলায় জিগ্যেস করল, কেন? ইস্কুল কি অপরাধ করল?

—দেখ দিকি···এই জুতো পরে ইস্কুলে যাওয়া যায়—পিচ বোর্ড বেরিয়ে পড়েছে।

—মুচিকে দিয়ে সেলাই করে নিতে পারিস নে?

—সেলাই করবার জায়গা আছে কোথাও? মুচির কাছে নিয়ে গেলে সে পুলিশে ধরিয়ে দেবে···

—বড্ড পাকা হয়েছিস। তিমির বিরক্ত গলায় বললে, যা এখন।

তপন মুখ গোঁজ করে বললে, বেশ যাচ্ছি। আমাকে ইস্কুলে যেতে বলো না। খালি পায়ে আর ইস্কুলে যেতে পারব না, কিছুতেই না। ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

ঘরে চিত হয়ে শুয়ে আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগল তিমির। ঘরে শুয়ে আকাশ দেখা যায় না, তাই রক্ষা। সেই আকাশে যেন অনেক প্রশ্ন, অনেক কৌতুক-কৌতূহল। তার চেয়ে ঘরের ছাদ-ই ভালো। ভাঙাচোরা শেওলা-ধরা, ডান দিকের ফাটলটা দিয়ে জল-গলে-পড়ার বিশ্রী হলদেটে দাগ। এই কলঙ্কিত ছাদের চেহারাটা যেন মানুষের জীবনেরই নিত্যকার ব্যবহারে বিবর্ণ ক্ষয়ে-যাওয়া রূপ। আরো জল পড়বে, আরো কলঙ্কিত হবে ছাদ, চূণবালি খশবে, দু-একটি করে ইঁটের পাঁজরা নড়বড়ে হয়ে অলক্ষ্যে স্থানচ্যুতও হবে, তারপর একদিন সমস্ত ছাদটা ভেঙে পড়বে। এইভাবেই ইতিহাস রঙ বদলায়—সংহার আর সৃষ্টির দ্বৈতলীলার মধ্যে। সতরো শতকের শেষে একদা-সমৃদ্ধ গৌড়নগরী ধ্বংস হল—ম্যালেরিয়া, ওলাউঠার কীটেরা শ্মশান করে তুলল সমস্ত রাজ্যকে। আর গৌড়ের ধ্বংসস্তূপের পাঁজরভাঙা ইটপাটকেল নিয়ে গড়ে উঠল নতুন শহর আংরেজাবাদ। মহানন্দার তীরে তীরে ইতিহাস রঙ বদলাল, ইংরাজ কোম্পানির স্নেহছায়ায় গড়ে উঠল নতুন জনপদ—মাউলদা-ইংলিশাবাদ। ১৭৭০ সালে হেঞ্চম্যান সাহেব গড়ে তুললেন কোম্পানির কুঠি—লকড়িখানা, মুর্গীখানা—ইতিহাসের চাকা ঘুরে চলল—নীলকুঠি আর রেশমকুঠির পত্তন। পাদ্রী টমাস সাহেব, কেরী সাহেব, বাইবেল আর দুর্ভিক্ষ, অনশন, মৃত্যু—রঙ বদলাল, ওয়াহবী আন্দোলন, সিপাহী বিদ্রোহ পাশ কাটিয়ে নিভৃতে গড়ে উঠল শহর, তারপর সিপাহী বিদ্রোহের দু বছর পরে স্বায়ত্ত শাসনচক্রে ঘুরপাক খেতে-খেতে অবশেষে ১৯১৩ সালে পূর্ণিয়া আর দিনাজপুরের অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে গড়ে উঠল কনিষ্ঠ শহর : মালদহ। তারপর······

—দাদা—শুনছ···।

ভাবনাজাল ছিঁড়ে গেল তিমিরের।

—এত কি ভাব বল তো? কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছি···

—না, কিছু নয়।

—মাথা ধরেছে?

তিমির হাসল।—বস্ আমার কাছে। বড্ড রোগা হয়েছিস তুই—চল বেড়িয়ে আসি, যাবি?

—সত্যি বলছ দাদা? সুলতা খুশিতে ঝলমল।—কোথায় যাবে?

—যেদিকে দু-চোখ যায়…

—ও, তুমি মিছিমিছি বলছ। যাবে না তাই।

—না রে না, সত্যিই যাব। চট করে তৈরি হয়ে নে।

রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল দুজনে।

আকাশে গোধূলির রক্ত মেঘ। বাদুড়গুলো চক্রাকারে আকাশ প্রদক্ষিণ করছে। আর বাদুড়গুলো দেখলেই তিমিরের অক্রুরমনি ইস্কুলের সেই মৌলবী সাহেবের কথা মনে পড়ে যায়। 'বলত দেখি: বাদুড় পাখি না জন্তু!' কতদিন এই মজার জিজ্ঞাসাটা তার কল্পনাকে ইন্ধন জুগিয়েছে। 'বাদুড় বাদুড় মিতে, ফল খাস তিতে।' হায়রে, সেই ছেলেবেলার মুগ্ধবোধ দিনগুলি।

বাঁধ রাস্তা ধরে সোজা দক্ষিণের দিকে পাড়ি দিল তারা। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আধুনিক সংস্কৃত কালেকৃটি। বি আর সেন লাইব্রেরী, মিউজিয়াম ছাড়িয়ে রামকৃষ্ণ মিশনকে পাশে রেখে আরো দক্ষিণে যেখানে ডাচ্ কুঠিকে সারিয়ে গড়ে উঠেছে সিভিল সার্জেনের রেসিডেন্স।

সন্ধ্যা আসর জাঁকিয়ে এল। তার কালো অঙ্গরাখার গায়ে জরির বুটি—নক্ষত্র উজ্জ্বল। মহানন্দার কালো জলের আয়নার দিকে তাকিয়ে সন্ধ্যা বধূ আপন প্রতিবিম্ব দেখছে।

বাঁধ রাস্তার এক প্রান্তে দুজনে বসল পা ছড়িয়ে। চীনেবাদামের খোসায় ভাবনাগুলি জমাট হবার প্রশ্রয় পায়।

সুলতার সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যত সহজে নিজেকে আজ মুক্ত

করে দেবে ভেবেছিল তিমির, পারল না। গুরুভার একটা পাথর যেন অহরহ তাকে তলিয়ে দিতে চাচ্ছে। সমস্ত চিন্তাগুলো যেন সম্রাটের মুকুটের আকার নিয়ে উঠছে। আর কোন কবি বলেছেন : পূর্ণিমা চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি। অতটা বাড়াবাড়ি সহ্য না-হলেও মনে হয় এই অনুভূতিতে সত্য রয়েছে।

সন্ধ্যার অবসাদখিন্ন প্রশান্তির অতল গর্ভে আস্তে আস্তে যেন তলিয়ে যাচ্ছে সুলতা। এইভাবে নদীর কূলে বসে আর কোনোদিন এমন সন্ধ্যা দেখেনি। সন্ধ্যা-তারা-ফোটা আকাশ যেন তারই মনের প্রতীক। ঘরে বসে বাদলার সন্ধ্যায় জোনাকিগুলি আলোর দ্যুতি জ্বালিয়ে যে-স্বপ্ন বোনে কতদিন মুগ্ধ হয়ে তাদের দেখেছে সে। আসন্ন রাত্রির গাঢ়তায় ফুটে-ওঠা এই তারাগুলির চোখ যেন আজ আরো দীপ্ত, কৌতুক-উজ্জ্বল। কি যেন বলতে চায় চোখের অব্যক্ত ভাষা দিয়ে। কি, কি বলতে চায় তারা। মহানন্দার অশ্রান্ত কল্লোলে স্তব্ধ দিগ্‌বধূর প্রশান্তিতে, নিথর নিষ্কম্প গাছগুলির পাহারায় কোথাও কি সেই অকথিত বাণীর ব্যঞ্জনা লুকিয়ে আছে।

কি যেন দাদাকে বলতে চায় সুলতা অথচ বলতে পারে না। সেইদিন বেড়াতে গিয়ে ভেবেছিল সব খুলে বলবে। কিন্তু বলতে গিয়ে দেখল আকাশ অনেক বড়, তারাদের চোখের ভাষাও অত্যন্ত নিষ্ঠুর-নির্লজ্জ, আর মহানন্দা যেন আগে থেকেই তার কলরোলে ব্যঙ্গ করতে শুরু করেছে। বলা হয়নি।

দিনের পর দিন এক দুশ্চিন্তা কালি করে দেয় মনকে। অশরীরী প্রেতের মতো যেন তাড়া করে বেড়ায় তাকে। নিজের শরীরের দিকে তাকাতে ভয় করে সুলতার। যে-দেহের উপর দিয়ে উনিশ ঋতুর শীত-বসন্ত পার হয়ে গেছে—সেই চেনা জানা পরিচিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলির উপর সন্দেহ জাগে। ওরা ইচ্ছা করলেই

তাকে প্রতারণা করে একেবারে নিঃস্বতার খাদে ছুঁড়ে ফেলতে পারে।

সৌদামিনীর নিপুণ চোখের মনোযোগের হাত থেকে নিস্তার নেই।

—কি রে খুকী, দিন দিন অমন পোড়াকাঠ হচ্ছিস কেন?

মায়ের কথায় চমকে ওঠে আরো। চোখ তুলে চাইতে পারে না। ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে হয়তো।

আয়নায় নিজের প্রতিবিম্বের দিকে অপলকে চেয়ে থাকে। তবে কি বাইরের শরীরে কোনো পরিবর্ত্তনের ছোঁয়াচ লেগেছে, রঙ বদলাচ্ছে চেহারার।

ফ্যাকাশে বিবর্ণ হয়ে ওঠে সুলতার মুখ। গলা শুকিয়ে আসে, হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন স্তিমিত হয়ে পড়ে।

যদি আশঙ্কাটা সত্যিই বাস্তবে রূপ নেয়।

দাদাকে কি একবার বলবে? এ-সংসারে যে একমাত্র সব অপরাধ ক্ষমা করতে পারে।

কিন্তু···না। তার আগে সৌরেশকে জিগ্যেস করবে, কেন এমন করে তার মাথায় কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে দিল সে। ভালোবেসে এমন কি অপরাধ করেছিল যার জন্যে তার এই শাস্তি, লাঞ্ছনা···

খাওয়াদাওয়ার পাট চুকিয়ে উঠতেই রাত্রি হয়ে এল।

এবার নিদ্রিত পুরী। আজ আকাশে জলঝড় নেই। বাইরে কি উচ্ছ্বসিত জ্যোৎস্না।

বিছানায় গা এলিয়ে অনেকক্ষণ পড়ে ছিল সুলতা। ঘুমের ঘোরে ওধার থেকে ছোট্ট বোন চেঁচিয়ে উঠল, ঘুমন্ত ভাইয়ের ভারি একটা পা ওর গায়ের ওপর এসে পড়েছিল। সুলতা ভাইকে সরিয়ে দিল। তপনের হাত ঝুলে পড়েছে মশারি ভেদ করে, ওর হাতটাও ঠিক করে দিল সে।

তারপর একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

কত রাত হবে? সদর রাস্তায় ফার্স্ট শো ভাঙা সিনেমা-যাত্রীর কণ্ঠস্বর। উচ্ছ্বাস, হাসি, গান। জ্যোৎস্না রাত্রির জন্যে ইলেকট্রিক কোম্পানি রাস্তার বাতি আজ আর জ্বালায়নি। বাজপড়া কবন্ধ নারকেল গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে চাঁদটা ঝুলছে।

সারা দিনের সংসারজোড়া খাটনির পর নিজেকে নিয়ে এত কবিত্ব করবার ফুরসত মেলেনা সুলতার। আঠার মতো ঘুমে চোখ দুটো জড়িয়ে যাচ্ছে। ঘিনঘিনে কয়েকটা মশা কখন থেকে তার নাকের ডগায় আর কানের পাতায় গুনগুন শুরু করেছে। ওই আকাশ ভরা জ্যোৎস্না, ঘরে নিবু নিবু বাতির আলো আর মশার বিরক্তিকর গুঞ্জন—কোনো কিছুই যেন স্পষ্ট করে দাগ কাটছে না তার চেতনালোকে।

কান পেতে অনেকক্ষণ ঘুমন্ত বাড়িটার মধ্যে হঠাৎ-কোনো জাগরণের লক্ষণ ধরবার চেষ্টা করল সুলতা। নাঃ এত রাত্রে কেউ জেগে নেই, দাদাও ঘুমিয়ে পড়েছে বহুক্ষণ।

গায়ে শাড়িটা ভালো করে জড়িয়ে দরজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল সে।

বিছানায় শুয়ে শুয়ে চিঠি লিখছিল সৌরেশ। মাথা তুলে হেসে বললে, পার্বতী! এত রাত্রে।

—কেন, কেন আমার সর্বনাশ করলেন? থরথর করে কাঁপছিল সুলতা।—কি করেছিলাম আপনার?

সৌরেশ বললে, বাইরে এমন পূর্ণিমা আর তোমার মুখে নিদারুণ অমাবস্যা। এমন রাতে তোমার অভিসার, তাকে ব্যর্থ করো না। বস।

—না বসব না। জবাব দিন আমার কথার। মার-খাওয়া জন্তুর মতো ধকধক করে জ্বলে উঠল সুলতার চোখ।

সৌরেশ শান্ত গলায় বললে, আচ্ছা পাগল তো! এত ভয় পাবার কি আছে?

—কেন পাচ্ছি জানেন না? দাঁতে দাঁত এঁটে জিগ্যেস করল সুলতা।—আপনাকে বিশ্বাস করেছিলাম তার যথেষ্ট শিক্ষা আমাকে দিয়েছেন।

সৌরেশ বললে, মিথ্যা মনের মধ্যে জট পাকাচ্ছ। আমি বলছি কিছু হবে না। দেখ তো আমার চোখের দিকে তাকিয়ে, আমার চোখকে অবিশ্বাস হয় তোমার?

সুলতা আর নিজেকে সংযত রাখতে পারল না। ওর সমস্ত দৃঢ়তা কঠিনতা যেন গলে গলে পড়তে লাগল। সৌরেশের চোখের ভাষা বড় সুন্দর—শরতের আকাশের মতোই নির্দোষ, স্পষ্ট। প্রিয়-জনের বুকের ওপর কান্নায় ভেঙে পড়ল সে। এত কান্না বোধ হয় কোনোদিন কাঁদেনি। অশ্রুবিকৃত স্বরে বিড়বিড় করে বললে, কেন তুমি অমন করলে। আমি তো তোমারই। জান, কি ভয় করছে আমার। দিনে রাতে আমার একটুও শান্তি নেই। ওগো আমি পাগল হয়ে যাব।

সৌরেশ ওর নরম চুলে মুখ ডুবিয়ে বললে, লতা, আমায় ক্ষমা কর। তোমার জন্যে, তোমার ভালোবাসার জন্যে আমি পৃথিবী ছাড়তে পারি। কথাটা জোরের সঙ্গে বলে ফেলে কেমন নিজের কানেই ঠাট্টার মতো শোনাল। সত্যি কি ভেবে বলেছে কথাগুলো, না রাত্রির প্রগল্‌ভ পাগলামি। পৃথিবী মানে কি সুলতার মতো এক টুকরো আটপৌরে মেয়ে। ওর মধ্যে কি তামাম পৃথিবীর স্বাদগন্ধ পায় সে। তবু, সুলতার শরীরে যেন কাঁচা আমের সুবাস, অনভিজ্ঞ কিশোরের মতো। ওর কেশদামে উগ্র তেলের উত্তেজনা নেই, উদ্ভিদের গন্ধ, সমগ্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় সচকিত সুতীক্ষ্ণ করা বিহ্বলতা। নরম ভিজে হাতে একরাশ শিশিরডোবা দূর্বার কোমলতা।

—লতা…

—উ…

—ল-তা…

—কি ?

—লতা-লতা-লতা···

—যাও। তুমি ভারি দুষ্টু।

—কেন ?

—এত নাম ধরে ডাকা। আমার লজ্জা করে না।

—তোমার নাম ভারি মিষ্টি, লতা—লতা, লতা—লতেব।

—আর আমি ?

—তুমি···একটু ভেবে বলতে হবে···

—থাক। বানিয়ে বলতে হবে না। কথার মিস্ত্রী!—যাও। তুমি ভারি অসভ্য। একটুও ধৈর্য নেই···। সৌরেশের মাথার চুল টেনে দিয়ে ছিটকে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সে।

—কে ? বারান্দায় কে ওখানে ? সৌদামিনীর গলা। ঘুমভাঙা, কর্কশ।

—আমি··। সুলতা দম বন্ধ করে বললে।

—খুকী, কি করছিস এত রাত্রে ?

—কলতলায় যাব। আলোটা নিবে গেছে। মিথ্যা কথা বলে ফেলল সুলতা।

—রান্নাঘরে তো দেশলাই আছে।

সুলতা রান্নাঘরের দিকে পা বাড়াল।

চণ্ডীচরণ ডাকলেন, খোকা শোন—

তিমির বেরতে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। চাকরির পর থেকে আজ মাস ছয়েক ধরে বাবার সঙ্গে কোনো কথাবার্তা হয়নি। সময়াভাব তো বটেই, তাছাড়া কোনো জরুরী প্রয়োজনও পড়েনি। আজকে বাবার ডেকে এই আলাপের ভঙ্গীতে সন্দেহের ছায়া দুলে উঠল।

চণ্ডীচরণ বললেন, বস এখানে।

তিমির বসল তক্তপোশের একপ্রান্তে।

চণ্ডীচরণ ভূমিকা না করে বললেন, নবদ্বীপে আমার এক ক্লাসফ্রেণ্ড নিবারণ ওকালতি থেকে অবসর গ্রহণ করে ওখানে বাড়ি করেছে। ওর ইচ্ছা ওর মেয়ের সঙ্গে তোমার বিবাহ দেয়। আমাদের পালটা ঘর—তোমার মা বলছিলেন···

বিস্ময়ে ক্রোধে হতবাক তিমির মুহূর্তকাল প্রৌঢ়-পাণ্ডুর চণ্ডীচরণের মুখের দিকে চেয়ে রইল। ব্যঙ্গে বিদ্রূপে বিকৃত হয়ে উঠতে চাচ্ছিল মুখের ভাষা। নিজেকে প্রাণপণে সংযত করে ধীর গলায় বললে, এ অসম্ভব। আমার পক্ষে এখন বিয়ে করা কোনো মতেই চলে না।

—কিন্তু···নিবারণ আরো জানিয়েছে সুলতা মাকে তার পুত্রবধূ করে নেবে।

তিমির বললে, আমাকে ক্ষমা করুন।

সৌদামিনী গজগজ কবে উঠলেন।—তোমরা ভাইবোনে পরামর্শ করে এসেছ দেখছি। কিন্তু আমরা গরিব মানুষ, টাকা পয়সা খরচ করে পালকি চাপিয়ে মেয়েকে শ্বশুরবাড়ি পাঠাব, সে-সামর্থ কোথায়। এ-সম্বন্ধ হাত ছাড়া করলে খুকীর বিয়ে দেব কি করে জানতে পারি?

তিমির বললে, সে জানার কথা আমার নয়। আর তাছাড়া সুলতার মতো বড় মেয়ে আজ অনেকের বাড়িতেই মিলবে।

সৌদামিনী মুখ ভার করে বললেন, কিন্তু ওর বিয়ে তো দিতে হবে। নাকি আইবুড়ো হয়ে থাকবে চিরকাল?

—উপস্থিত সেইটেই এখন জরুরী নয়। একদিন বিয়ে ওর হবেই।

—একেবারে খালি হাতপায়েই মেয়েকে নিতে চাচ্ছেন নিবারণবাবু আর ওঁর মেয়েটিও এমন কানা খোঁড়া নয়। এই তো ফোটো পাঠিয়েছে দেখ না।

—না মা। আমাকে বিয়ে করতে বলো না।

সৌদামিনী বিরক্ত হয়ে বললে, এ তোমার জেদ বাপু। আজকাল ছেলেছোকরাদের যে কী ফ্যাশান হয়েছে। আচ্ছা তুমি না হয় বিয়ে

না করে সন্ন্যেসি হবে, কিন্তু সুলতা? অত বড় ধাড়ী মেয়ে ও পারবে কেন! নাটক নভেলে বলেছে না, বাড়িতে সোমত্থ মেয়ে পোষা মানে ঘরে আগুন নিয়ে বাস করা।

তিমির বললে, সুলতা তেমন মেয়ে নয়। ওর আগুনে ঘর পোড়ে না, রান্নাঘরে উনুন জ্বলে।

—হুঁ পণ্ডিত ছেলের সঙ্গে কথায় পারব কেন! আমরা মুখ্যু মানুষ। ঘরে তো তোমাকে থাকতে হয় না। মাথার পরে ভগবান রয়েছেন, তাঁর চার চোখ খোলা; তাঁর দৃষ্টিকে ফাঁকি দেবে কি করে? চোখ মেলে দেখেছ কোনোদিন সুলতা দিন দিন কেমন হয়ে পড়ছে, সারাক্ষণ কি যে ভাবে ছুঁড়িটা কে জানে···

—আঃ কি আরম্ভ করলে তুমি। ধমক দিয়ে উঠলেন চণ্ডীচরণ।

তিমির মুখ নিচু করে নিজের ঘরে ফিরে এল। এসে দেখল ওর বিছানায় মুখ গুঁজে সুলতা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ওর পিঠের কাছে বসে সস্নেহে ডাকল তিমির।—কি হয়েছে? কাঁদছিস কেন বোকার মতো?

সুলতা বিদ্যুদ্‌স্পৃষ্টের মতো উঠে দাঁড়িয়ে তিমিরের পা জড়িয়ে ধরল। অশ্রুবিকৃত স্বরে বিড়বিড় করে বলে উঠল, আমি কি অপরাধ করেছি তোমাদের কাছে যে আমাকে তাড়াতে চাচ্ছ?

—আরে কি করছিস—ওঠ ওঠ—আচ্ছা পাগল তো।

—তোমাদের সংসারে এক কোণে পড়ে থাকব। বাসন মাজব, রান্না করব। কিন্তু আমাকে বিয়ে করতে বলো না।

—ও এই কথা। তিমির ওকে টেনে তুলে বললে, তুই অবাক করলি লতা, মেয়েছেলে বিয়ের নামে মড়াকান্না কাঁদে কোনোদিন শুনিনি। বল, বিয়ে করবি না কেন, বল আমাকে?

সুলতা চুপ করে হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে রইল। কিছু বলতে পারল না, আঁচলের খুঁটটা শুধু আপনমনে পাকাতে শুরু করল। দাদার জেরা এত স্পষ্ট, প্রখর যে তার আলোতে চোখ তুলে তাকানো যায় না।

তিমির কি ভেবে একটু পরে হেসে বললে, ও—বুঝেছি। আচ্ছা —আচ্ছা হবে।

সুলতার মুখ থেকে এক লহমায় যেন রক্ত সরে গেল। কি, কি বুঝেছে দাদা! ধকধক করে বেজে উঠল হৃৎপিণ্ডটা। তবে কি ধরা পড়ে গেছি দাদার কাছে। মাগো, কি লজ্জা! কি বেহায়া ভাবল দাদা তাকে। ছি!...

সুলতা জড়ানো পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার পর অনেকক্ষণ খোলা জানলার ধারে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তিমির।

সংসারের উর্ধ্বশ্বাস জীবনবেগের কাছে আত্মসমর্পণ করে মরিয়া হয়ে ছুটে চলেছিল। কোনো একসময় হয়তো আরো দশজন বাঙালী যুবকের মতো নরম শিশির জড়ানো ছিল চোখের পাতায়। বেলা বেড়েছে, সূর্যের প্রখর কিরণে স্বাভাবিকভাবেই উবে গেছে প্রভাতী শিশির-স্বপ্ন। বই পড়েছে প্রচুর, ভেবেছেও বিস্তর। কিন্তু, হাতেকলমে জীবনের কর্মশালায় নেমে দেখেছে, ভাবনা এক জিনিস, কাজ অন্য। তারপর জীবনের যা কিছু সাজানো-গোছানো কবিতা বাস্তবের ঘায়ে একদিন কঠোর-কঠিন গদ্যে পরিণত হয়েছে।

বাপমার আজকের এই অদ্ভুত প্রস্তাবে নিজের হাস্যকর দুরবস্থার চিত্রটাই বার বার চোখের সামনে দুলে উঠতে চাইল। বিবাহ সম্পর্কে অর্থহীন গোঁড়ামি নেই তার। খাঁটি দুর্বলতাই রয়েছে। দীর্ঘ নীরস জীবন পরিক্রমায় ওটাই হয়তো সাধারণ জীবনের একমাত্র চিত্তাকর্ষক রোমান্স। যত স্বল্পায়ু হক, তার আবেদন মানুষের মনিকোঠায় এক নতুন রূপকের জন্ম দেয়।

কিন্তু, জীবনের এই একমাত্র গোপন সতৃষ্ণ আসক্তিকে যখন দৈনন্দিন বিশ্রী জৈবীলীলার পাঁকে টেনে আনবার চেষ্টা চলে তখন জীবনের তারে আর কোনো সংগীতই ফোটে না। কাঁসা তবলার চাঁটির মতো ধবধবে শব্দটা নাকী সুরে নিজেকেই ঠাট্টা করে। নিরাবেগ নিরানন্দ পিতৃ-পিতামহিক জান্তব যৌন কান্নার জের টেনে

লাভ নেই। ওটা এক ধরনের পলাতক কাপুরুষতা। বন্ধু জগদীশের সঙ্গে তার কোনো পার্থক্য নেই।

সহকর্মী বিনয়ের কথাই বোধ হয় ঠিক। এ-যুগটা এসেছে স্বার্থত্যাগের দাবি নিয়ে। বিবাহের মধ্যে স্বার্থপরতার একটা মোটা সুর—মানুষকে অন্ধ সংকীর্ণতার দড়িতে বেঁধে রাখার ফাঁদ।

নির্জন রাত্রি।···

বাইরের কোলাহল শান্ত হয়ে এসেছে। ইতস্তত ছেঁড়া ছেঁড়া কুকুরের ডাক।

বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে চিঠি লিখছিল সৌরেশ বন্ধু শৈবালকে।

"ভাই শৈবাল,

এই গভীর রাত্রে তোমাকে কিছু লিখব, ঠিক ছিল না। কিন্তু রাত্রির এমন একটা নিজস্ব মাদকতা আছে যা আমাকে বিহ্বল করে তুলেছে। তোমাকে লেখাটাই একমাত্র উদ্দেশ্য নয়, তুমি যদি নাও থাকতে তবু আমাকে নিজের জন্যেই এমনি ধারা লিখে যেতে হত। আমার মনে যারা তুমুল কোলাহল করে উঠেছে তারা তো আমাকে নিশ্চুপ থাকতে দেবে না। তারা আমাকে বকাবেই।

ঘটনাটা আকস্মিক। আকস্মিক হলেও, তোমার কাছে বলতে লজ্জা নেই, আমার মনের গোপন প্রদেশে তার জন্যে পূর্ব থেকে সিংহাসন পাতা ছিল বইকি। হয়তো একদিন এইভাবেই চরম বিস্ফোরণ ঘটত, মানুষের সাধ্য কি সেই দুর্নিবার আবেগকে রুদ্ধদ্বারে আটকে রাখবে। মানুষ ঘটনার পতাকাবাহী নয় জানি, কিন্তু এক-একসময় এই ঘটনা স্রোতই কি উদ্দাম গতিতে কুটোর মতো তাকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

সুলতার কথা তোমাকে আগেই বলেছি। দুর্ঘটনাটা ঘটল

সুলতাকে নিয়েই। এই ভাঙাচোরা শ্রীহীন ছন্দহীন বাড়িতে গোধূলির আলোকে মেয়েটিকে যেদিন আবিষ্কার করলাম সেদিন ভাবিনি এই মেয়েকে কোনোদিন আমায় ভালোবাসতে হবে। ভালোবাসার চেয়ে আমার লোভটাই ছিল উদগ্র। সেদিন মনে মনে বললাম, এ-মেয়ে আমার জন্যেই। এ-পূজার ফুল আমার মতো দেবতার ভোগেই উৎসর্গীকৃত। একে জয় করবার প্রশ্ন নেই, এ পায়ে লুটিয়েই আছে। আমার নোংরা হাত বাড়িয়ে দিলাম ওর দিকে। কী আশ্চর্য, আমাকে বিন্দুমাত্রও ভয় করল না সে, সহজ সরল অনাড়ম্বর ভূমিকায় আমার হাতকে বিশ্বাস করে ফেলল। নিজের লোভের জিভ নিজেই লেহন করতে করতে শিউরে উঠলাম। হাড়ে হাড়ে বুঝলাম, এ-মেয়ে সহজ বলেই কঠিন। আমার নোংরা হাত আমারই অজানতে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে দিল সুলতা। ওর নির্মল চোখের সূর্যালোকে আমার অন্ধকার দুর্গন্ধভরা পুরীতে উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে দিল সে। আমাকে দেবতা বলে মাথায় চাপায়নি, দুর্বল করুণ মানুষ বলেই পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ওর সত্য-সুন্দর আলোর ধারায় আমার চোখ স্নান করল, মন উঠল জুড়িয়ে, সত্যি বলতে কি, বাঁচবার নতুন সঞ্জীবনী মন্ত্রে আমাকে অন্ধ বোধে উত্তীর্ণ করল।

দিন বয়ে চলল। চলল আমাদের নতুন জীবন-গঠনের যুগ্ম প্রচেষ্টা। আমরা পরস্পরকে গড়তে শুরু করলাম। সুলতাব কল্যাণে জীবনের যখন নতুন ব্যাখ্যা মিলল দেখলাম এতকাল জীবনকে নিয়ে শিব গড়তে গিয়ে বাঁদর গড়ে তুলেছি। বর্তমানের ঐশ্বর্যে নিজের জীবনকে ভরতে গিয়ে অতীতের সব কানাকড়িই খরচ হয়ে গেল। তবু, এ-রিক্ততার মধ্যে আনন্দ ছিল। নিজেকে চিনলাম, সুলতার প্রেম আমার আপনকে ভালোবাসল। আমি ধন্য হলাম।

ভাবলাম যাক বাঁচা গেল।

কিন্তু বাঁচা কি গেল সত্যিই! যার ভেবেছিলাম মৃত্যু হয়েছে,

যে-নির্লজ্জ নোংরা লালসাটুকু নবীন সাধনার চাপে সংস্কৃত হয়ে এসেছিল ভেবেছিলাম, সুযোগ বুঝে দুর্বলতার আশ্রয়ে হঠাৎ ছোবল দিয়ে উঠল আমার সর্বশরীরে। বিষে নীল হয়ে গেল দেহ। আমার ভালোবাসার স্বর্ণদীপটিকে এক ফুঁয়ে নিবিয়ে দিয়ে আমি রাত্রির পাপকে বেছে নিলাম। সুলতার সেবা-শুশ্রূষায় যে-পরম মূল্যকে সগৌরবে কিনে নিয়েছিলাম, সাধারণের হাটে তাকে বিকিয়ে দিলাম। সে-এক ঝড়-বাদলের রাত্রি····নিদারুণ হীনতার বোঝা মাথায় নিয়ে সুলতার কাছে আমি ছোট হয়ে গেলাম।

আরো পরিষ্কার করে বলি শৈবাল। সুলতার দেহকে আমি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করলাম। সুলতা কাঁদল না, অভিযোগ কবল না। টলতে-টলতে বেরিয়ে গেল আমার ঘর থেকে।

তারপর গভীর অনুশোচনায় বেদনায় আমার দিনগুলি খাঁ খাঁ করে উঠল। দেহে মনে আমি ফতুর বনে গেলাম। এমন অসহায়ত্ব রিক্ততা বোধ করি কেনোদিন আমাকে এমন পীড়িত করে তোলেনি। ভাবলাম সৌরেশ মরেছে, এইখানেই তার জীবন নাট্যের যবনিকা পতন।

আমার চিঠি পড়ে জানি তুমিও আমাকে ঘৃণা করবে। কারণ ঘৃণাই আমার প্রাপ্য। আমার দুষ্কৃতির জন্যে ক্ষমা আমি চাইব না। এই রাত্রে কেবল একটা কথাই আমার মনে জাগছে ঃ কেন এমন হয়? বিশ্বাস কর শৈবাল, আমি নিজের জীবনকে বদলাতে চেয়েছি, সুলতার প্রেমে আমি নতুন হয়ে উঠছিলাম। আজ যদি তোমরা আমাকে চরিত্রহীন ইতর বল আমি মানব না। কারণ আমি ইতর নই। তবু কেন এমন হল? আমার আন্তরিক শুভবুদ্ধি সত্ত্বেও আমি কেন এমন করে মুখ থুবড়ে পড়লাম। আমার পাপের কি শেষ নেই! আমার কলঙ্কময় অতীত কি এমনি করেই আমাকে ক্রমশ পতনের পাঁকে টেনে নামাবে!

জীবনের দুঃসাহসিক বন্ধুর পথে আমার অভিযান। ভয় কাকে

বলে জানি না। কিন্তু এবার যেন সত্যিকার এক ভয় আমাকে আকণ্ঠ গ্রাস করে ফেলতে চাচ্ছে। জীবনকে একদিন বেহিসেবী খরচ করে চলেছিলাম, কারণ জীবনের কোনো দাম ছিল না আমার কাছে। সুলতার প্রেম আমার জীবনকে মূল্যবান করেছে, তাই এই দামী জীবনটাকে এইভাবে নিঃস্ব হতে দেখে ভয়ে আমার শরীর কাঁপছে। বলতে পার শৈবাল, এই অবস্থায় আমি কি করব।

সুলতার জীবনে (ঈশ্বর না করুন) যদি আজ কোনো দুর্ঘটনাই ঘটে, তাহলে তাকে বিবাহ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। কিন্তু ভাবছি বিয়ের নিষ্পত্তির মধ্যে দিয়েই কি এই মূঢ়তার বীজ চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে! সুলতা হয়তো ক্ষমা করে আমাকে ভালোবাসবে একদিন, কিন্তু তার মনে যে ঘা দিয়েছি তার ক্ষত কি কোনোদিন শুকবে। সুলতার কাছে আজীবন হয়তো অপরাধী হয়ে থাকতে হবে।

আর অপরাধী হয়ে থাকব আমার নিজের কাছেই। আমার চরিত্রের ওপর কোনোদিন নিজেরই বিশ্বাস থাকবে না। বিয়ের পরে সুলতার প্রেম হয়তো আরো ধিক্কৃত, আরো লজ্জিত হবে। এই দ্বন্দ্ব, সংশয় নিয়ে মানুষের বাঁচা চলে না। অতীতের গলা টিপে ধরেই বর্তমানের মধ্যে আশ্রয় নিতে হবে। কিন্তু, কই জিততে পারছিনে তো। আমি হেরে যাচ্ছি, আমি হেরে যাচ্ছি ...."

আপিসে জগদীশ ফোন করল।—সুষমা মানে আমার স্ত্রী মরণাপন্ন। শীঘ্র এস।

ফোন পেয়ে স্তম্ভিত তিমির। এই গেল-হপ্তাতেও তো জগদীশের বাড়ি থেকে ঘুরে এসেছে। সুষমার তো অসুখ-বিসুখের কোনো খবর পায়নি। হঠাৎ তিনচারদিনের মধ্যেই কখন-বা অসুখ হল আবার এরই মধ্যে বাড়াবাড়ি।

আপিস থেকে ছুটি নিয়ে দ্রুত বেরিয়ে পড়ল। হেঁটে গেলে প্রায় আধঘন্টা লাগবে। তাই একটা রিক্‌শা ভাড়া করল সে।

জগদীশের বাড়িতে পৌঁছল তিনটে নাগাদ।

উষ্কখুষ্ক আলুথালু জগদীশ ম্লান মুখে বললে, আয়—

তিমির জিগ্যেস করল, উনি কেমন আছেন এখন? হঠাৎ এমন কি হল?

জগদীশ বললে, বাচ্চা হবে। সাতমাস। কাল রাত্রে অন্ধকারে বারান্দা থেকে পড়ে গিয়ে শক্‌ খেয়েছে। রক্তপাত হচ্ছে। ডাক্তার হেমারেজ বন্ধ করতে পারছেন না।

—কোন ডাক্তার দেখছেন? ডকটর দাশকে কল্‌ দিয়েছ?

—না। আমাদের পাড়ার মজুমদারই দেখছেন....

—হসপিটালে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা যায় না?

—এই অবস্থায় রুগীর নড়াচড়া নিষেধ। যে কোনো মুহূর্তে হার্টফেল করতে পারে।

তিমির ঘাবড়ে গেল। এই অবস্থায় কি যে করা যায়...অথচ একটা কিছু করতে ইচ্ছে করছে। নিজেকে বড় অসহায় বোধ হল।

জগদীশ হঠাৎ হাউমাউ করে কেঁদে উঠল।—ওকে আর বুঝি বাঁচানো যাবে না ভাই। সী ইজ লস্ট, লস্ট ফরএভার...

জগদীশকে সান্ত্বনা দেবে কি, ওর এই শিশুর মতো কান্না দেখে বিমূঢ় হয়ে পড়ে তিমির। জগদীশের এই কান্নার ভঙ্গীতে কতখানি আন্তরিকতা আর কতখানি মেকিত্ব - সে কথা ভাববার প্রয়োজন নেই। হয়তো আজকের এই গভীর কাতরানিটুকু একদিন ওর কাছেই তামাশা বলে ঠেকবে। তবু, আজকের এই ক্ষণটুকু সত্য বলেই মনে হচ্ছে তিমিরের। আগেকার সেই ফাঁপা-ফোলা ফেনানো জগদীশ নয়, কথায় আর ব্যবহারে ভঙ্গুর। এ-জগদীশ ভাবনায় কর্মে সিরিয়াস, আরো দশজন ভালোমানুষের মতো নিরীহ আবেগমুখর।

জগদীশ বিকৃত গলায় বললে আবার।—তোর কাছে লুকব না ভাই। আমি....আমি সুষমাকে খুন করেছি।

—আঃ পাগলের মতো কি বলছ জগদীশ।

—হ্যাঁ, ব্রাদার হ্যাঁ। আমার অসংযম জীবনের উৎপীড়ন পাগল করে তুলেছিল সুষমাকে। ইউ নো সী ইজ বাট এ চাইল্ড। কাল রাত্রে উৎপীড়ন চরমে ওঠে। ও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে ঘর থেকে ছুটে পালাচ্ছিল, বারান্দায় পড়ে গিয়ে এই ট্রাজিডি। জগদীশ এক মিনিট চুপ করে থেকে বললে, ও ইট ইজ এ হোরার। ডেঞ্জারাস সেক্স-লাইফ। ওর এই শরীরের অবস্থা তবু রোজরাত্রে ওকে পাশে না পেলে আমি খেপে যেতাম।

—ব্রুট! তিমিরের মুখ থেকে অস্ফুটে বেরিয়ে এল।

—সত্যিই আমি ব্রুট, আমি ক্রিমিনাল, ব্রাদার। সাগরের সব জল দিয়েও আমার এই নোংরা হাত ধোয়া যাবে না। কিন্তু, আমি ভাবছি, এত বছরের সভ্যতা-সংস্কৃতির পরেও মানুষের ভেতরকার এই পশু কেন আজো শান্ত হল না।

জগদীশের ঘিনঘিন করা এই যৌনতত্ত্ব আর ভালো লাগছিল না। তিমির ভাবছিল অনভিজ্ঞ ওই মেয়েটির কথা। সংসার তাকে টেনে হেঁচড়ে বড় করে দিল, ভয় পায়নি তবু, বুক দিয়ে রক্ষা করেছে নিজের ছোট্ট সংসারটাকে। যেখানে আবেগ আছে, আনন্দ আছে, ভয় আছে বেদনা আছে। তবু, বাঁচতে পারল কি সুষমা! পুরুষের বর্বরতা তার জীবনকে উড়িয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল।

—ডক্টর···ডক্টর···চিৎকার করে উঠল জগদীশ।

—চুপ করুন জগদীশবাবু। ওঁর স্বর্গত আত্মার শান্তি হক। ডাক্তার বিড়বিড় করে বললেন।

তিমিরের আসার পর আর আধ ঘণ্টাও টিকল না। সুষমা মারা গেল।

এত মৃত্যু, আমাদের জীবনে এত মৃত্যু কেন!

শিশু সন্তানটিকে কোলে টেনে নিয়ে পাথরের মতো দাঁড়িয়ে রইল জগদীশ। যেন যুগযুগকার স্তম্ভিত মূর্তি।

—জগদীশ, জগদীশ····। তিমির ডাকল।

—আমি ঠিক আছি, ঠিক আছি ব্রাদার। হঠাৎ হা হা করে নাটকীয় ভঙ্গীতে ভূতুড়ে হাসি হেসে উঠল জগদীশ। সে-হাসির ঢেউ একটা ভোঁতা যন্ত্রণার মতো পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে উঠল ওর হৃদয় থেকে, তারপর মুখে চোখে ঠোঁটে ছড়িয়ে পড়ল। গমকে গমকে। হা হা হা —হা হা হা।

সাতটা দিন ঘরের মধ্যে দরজা বন্ধ করে অর্ধ অনশনে কাটিয়ে দিল জগদীশ। তিমির শঙ্কিত হয়ে উঠল আত্মহত্যা না করে বসে। কিন্তু সে সব কিছুই করল না সে। সুষমার ফোটোর সুমুখে মৌনী-তাপসের মতো ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে কাটাল। বেঁচে-থাকতে যার মূল্য গভীরভাবে বুঝতে পারেনি সেই সরল অকপট মেয়েটি যেন মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে তার চোখে অনেক মহান, দেবীতুল্য হয়ে উঠল। মনে হল, এই অমর স্মৃতিকে বক্ষে ধারণ করেই সারা জীবন-তরী বইয়ে দেয়া অসম্ভব হবে না।

সাতদিন পর দরজা খুলে বেরিয়ে এল জগদীশ। দাড়ি কামাল। পরিষ্কার জামা কাপড়ে বদলে ফেলল তার চেহারাটা। বিড়িতে টান দিয়ে বললে, এইভাবে স্মৃতির বোঝাকে বাড়ানোর অর্থ নেই তিমির। সুষমার স্মৃতিরক্ষার জন্যেই আমার আবার বিবাহ করার দরকার।

এবং কি-আশ্চর্য, এক মাস যেতে-না-যেতেই তার কনিষ্ঠা শ্যালিকাকে ঘরে নিয়ে এল জগদীশ।

দিন গড়িয়ে চলল।

আরো দিন গড়িয়ে চলল।

নদীর ওপারে তখন দিন শেষের সূর্য সোনা ঢালছে। আকাশে

রঙের বিলাসিতা। ঝিরঝির কাঁপছে নদীর জল, হাওয়ার গন্ধ লাগছে এসে নাকে।

কত বন্ধ্যা কথা আজ যেন ফুল হয়ে উঠছে, নতুন এক জীবনের গান গুনগুন করছে তার রক্তে।

বিনয় হাওয়ায় ছুঁড়ে দিল তার কণ্ঠস্বর। বললে, কাল আমাদের বিয়ে তিমিরবাবু—

মুখে ব্যর্থ হাসি টেনে কাঁপা গলায় বললে তিমির, তাই নাকি?

বিনয় বললে তরল গলায়, তিন বছর ধরে আমরা পরস্পরের জন্যে অপেক্ষা করলাম। ওর বাড়ি কিংবা আমার বাড়ি কেউই বুঝল না আমাদের বিয়ে করবার প্রয়োজনটা। কমলা বললে, বিয়ের পরেও তো আমাদের পরস্পরের সংসারের জন্যে স্বার্থত্যাগ করতে হবে, চাকরি তো আর ছাড়া যাবে না। (কমলা টেলিফোনে চাকরি করে)। কাজেই নিজেদের উদ্যোগেই বিয়ের মতো জরুরী কাজটা সেরে ফেলতে হচ্ছে। ওরা আবার বৈদ্য আমরা বামুন।

তিমির বললে, বাড়িতে গোলমাল উঠবে না তো?

বিনয় বললে, আমরা রেজিস্ট্রি ম্যারেজ করছি। যতদিন সংসারে টাকার প্রয়োজন রয়েছে ততদিন কোনো গোলমাল ওঠার তো কথা নয়।

তিমিরের চোখে বিনয় যেন নতুন এক আবিষ্কার। মাথায় পাতলা হয়ে আসা চুল, মুখাবয়বে গাছের বাকলের মতো আঁকিবুকি, চোখের কোলে পাখির পায়ের মতো দাগ, উনচল্লিশ বছরের বিনয়কে বিকেলের ধূসর-পাণ্ডুর আলোকে অপরূপ দেখাচ্ছে। দেহে কেরানীর অকাল বিবর্ণতা এলেও, চোদ্দ বছরের কেরানী যুদ্ধক্ষেত্রের জ্বালা সহ্য করেও মনকে সে শ্যামল রেখেছে। জীবনের রুক্ষতাকে স্বীকার করেও নিভৃত স্বপ্নের দীপটিকে লালন করে চলেছে সে। বিনয় প্রেমিক। জীবনের বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সে সঙ্গী পেয়েছে, হাত ধরাধরি করে

এগবার, প্রেরণা পাবার। বেঁচে থাকার দুরন্ত সমুদ্র মন্থন করে টেনে তুলেছে লক্ষ্মী আর অমৃতের ভাণ্ডকে।

বিনয়ের স্বপ্ন যেন তিমিরের গুমট প্রাণেও আশ্বাসের ঝিলিক ছড়িয়ে দেয়। বিচিত্র বন্ধুর পথ এই জীবনের। কষ্ট আছে, বেদনা আছে—সংগ্রামহীন মৃতজীবনে গতিবেগ নেই। তবু এই শ্রম, এই তীব্রতা লাঘব হয় একটি ভালোবাসার মেয়ের হৃদয়ের রক্তে।

বিনয় মুগ্ধ মানুষের মতো বলে গেল তার ভবিষ্যৎ জীবনের রঙিন দিনলিপি। ছোটখাটো সুখ আর আনন্দে ঠাসা দিনগুলির কথা।

বিনয়কে হিংসা করতে ইচ্ছে হয় তিমিরের।

ভালোবাসা, আহা, ভালোবাসা!

একরাশ মুগ্ধ গোলাপ যেন।

কোনো দিন কি স্বপ্ন দেখেনি তিমির। তার ইন্টেলেকচুয়াল ক্ষুধা আর জৈবিক তাড়নাকে মিলিয়ে। মনীষা! অত্যন্ত স্পষ্ট উচ্চারিত ওর অস্তিত্ব, ওর দেহের তীব্র কোলাহল মনকে দেয় আড়াল করে। মনীষার মধ্যে ভালোবাসার ঐশ্বর্য নেই!

ওপারের ঝোপঝাড়ের আড়ালে সূর্যাস্তের শেষ রক্তটুকুও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল, এল অন্ধকার ঘনিয়ে। নিবিড় ভালোবাসার মতো রাত্রি। নদীর কালো জলে তার কলকণ্ঠ। উতোল হাওয়া নরম রেশমের জাল বুনে দিল।

নক্ষত্রালোকের অজস্র প্রতিবিম্ব কালো জলে ঝিলমিল। দ্বিতীয়ার শীর্ণ চাঁদ নার্শিসাসের মতো আপন দেহগন্ধে মদির।

বিনয় বালিতে আঁচড় কাটছিল অন্যমনে, আর তাকিয়ে ছিল জলেস্থলে একাকার পটভূমির দিকে।

তারপর মুখ তুলে তিমিরের দিকে ফিরে বললে, আপনাকে কিন্তু আমাদের বিয়ের সাক্ষী হতে হবে।

তিমির বললে হেসে, আমার জন্যে কি আর বিয়ে আটকাবে। বেশ—আমি যাব।

তিমির বিদায় নিয়ে উঠে পড়ল।

এখুনি একটা ট্যুশনি ছিল দক্ষিণ অঞ্চলে। কিন্তু, না। আজ আর ভালো লাগছে না। এই নির্জন রাত্রি, এই দুর্লভ অবকাশে মনের ভাণ্ডার কেমন স্বপ্নিল রোমান্টিক হয়ে আসছে।

পথের দুধারে স্তম্ভিত উর্ধ্ববাহু দেওদার গাছের সারি, পায়ের তলায় লাল খোয়া-ছড়ানো পথ। ইতস্তত পথিকপায়ের ছন্দ। আর মাথার ওপরে খণ্ড ভগ্ন চাঁদ।

এমনি করে এই নরম রাত্রির পথ চলা যেন শেষ না হয়। যুগযুগ ধরে মানবমনের এ-এক অনির্দেশ্য রোমান্টিক অভিসার। 'পথের শেষ কোথায়। কি আছে শেষে?' দুঃখ আছে বেদনা আছে, আছে শ্রান্তি আছে ব্যর্থতা—তবু এগব। পায়ের ঘষায় পথের কর্কশ খোয়া এই ভাবে একদিন মোলায়েম, সহজ হয়ে আসবে।

এই পথে একদিন মনীষাকে পেয়েছিলাম। কিন্তু, ওর কথাই কেন মনে পড়ছে!

দেহবিলাসী মনীষার মনের রাজ্যে প্রেমের গভীর গাম্ভীর্য কোথায়! ছিল নাকি? কি চেয়েছিল ওই একটুকরো মেয়ের মধ্যে....একদিন যখনো সাতসমুদ্রের জলে ওর হাত নোংরা লবণাক্ত হয়ে ওঠেনি—ওর ভিজে বকুলের গন্ধ মাখানো মুঠো ছিল তার মুঠোর মধ্যে। কেন দৃঢ়ভাবে সেই মুঠোকে অধিকার করেনি সে। কেন দিল মুঠো আলগা করে, আর সেই আলগা মুঠো আর বকুলের গন্ধ যেন ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল পথের ধুলোয়। আজ সেই হাতকে যদি দশের হাত এসে পীড়ন করে বেঢপ বেমানান করে দিয়েই থাকে তাতে মনীষার দোষ কোথায়! তিমির এই দুর্ঘটনার জন্যে দায়ি।

নিজের মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে ক্ষত বিক্ষত হয়ে পড়ে তিমির।

কিন্তু, কি করে সে সম্ভব হত। কি ছিল তিমিরের ঐশ্বর্য, কিই বা দিতে পারত। তার গরীবিয়ানা দিয়ে মনীষার ধনী মনকে কি ভরে দেওয়া সহজ হত!

আবার তুমুল কোলাহল করে ওঠে মনের ভেতরটা। মনীষা তাকে গরিব জেনেও তো হৃদয় অর্পণ করেছিল।

কিন্তু···না না না···প্রেম মিথ্যা···প্রেম মিথ্যা···

ভীষণ তাড়া খেয়ে দ্রুত পা ছুটিয়ে দিল তিমির।

কোথায় যাবে সে ?

হঠাৎ মনীষাদের বাড়ির গেটটার সামনে এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজনায় চোখমুখ জ্বালা করছে, বুকের ভেতরটা আর্তনাদ করে উঠছে।

এই নিঃশব্দ রাত্রি, এই ক্ষণিক দুর্লভ অবসর—আজ যদি মনীষা আমাকে না ফিরিয়ে দেয় তাহলে তাকে আমি টেনে নেব আমার পাশে।

কলিং বেল-এ উন্মাদের মতো চাপ দিল তিমির।

—কৌন হ্যায়···। দরোয়ানের গলা।

—দিদিমনি দিদিমনির সঙ্গে দেখা করব।

—দিদিমনি বহার গিয়া।

ইলেকট্রিক শক্ খেয়ে নিজের সম্বিত ফিরে পেল তিমির। দরদর করে সারা শরীরে জ্বর ছাড়ার মতো ঘামের নদী বইছে, আর চোখ আর কানের পর্দা যেন জ্বালা করছে।

—বাবুজির কুছ্ কাম ছিল ? দরোয়ানের দরদী গলা।

—না। কিছু নয়।

ফিরে গিয়ে যেন বাঁচল তিমির।

সে অতীতকে বর্তমানের পাতায় ফিরিয়ে আনতে চায়। সে মূর্খ! যে-অতীত মৃত তার পুনরুজ্জীবন নেই। ইতিহাস-জ্ঞানও তাকে রোমান্টিক করে তোলে! গৌড় ফিরবে না, তার ধ্বংসস্তূপে বসে কান্নার প্রবাহ বইয়ে দিলেও কবরের গর্ভ ভেদ করে অতীত উঠে আসবে না। সে-কবরে কতবার ঘাস গজিয়েছে, ঘাসের শয্যা থেকে সাপেদের হিংস্র চোখে ফসফরাস জ্বলেছে, সোনা মসজিদ

মতিমসজিদ ফিরোজ মিনার কোথা থেকেও আজানের সুর আর চকিত পথিককে তৃষ্ণার্ত করে তুলবে না। সতরো শতকের শেষেই গৌড় ধ্বংস হল, যদিও ওর মনের ফাটল ধরেছিল আগেই। গৌড় গেল, গৌড় বঙ্গ সৃষ্টি হল না, শহর হল ইংরাজ কোম্পানির বারবনিতা শহর: আংরেজবাজার। নতুন ইতিহাস—নতুন ইমারত।

আর নতুন মানুষ।

কিন্তু, ইতিহাসের চাকাও কি চক্রাকারে ফিরে আসে। নইলে ভাবনারও অতীত এমন অসম্ভব ঘটনা ঘটতে পারে।

সেদিন টিফিনের পরে ফাইলের স্তূপ নিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল তিমির।

হঠাৎ উগ্র সৌগন্ধিতে সারা অফিসটাকে চকিত করে পর্দা ঠেলে ঢুকল মনীষা। হ্যাঁ মনীষাই! আর চেয়ারম্যান-দুহিতার আগমনে কেরানীকুল উঠেছে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে। এমনকি বড়বাবুও হাঁ হাঁ করে ছুটে এসেছেন।

—মা তুমি···বাবার খোঁজে এসেছিলে? চেয়ারম্যান সাহেব তো ম্যাজিস্ট্রেটের কামরায় গেছেন।

মনীষার চোখ ঘুরছিল কেরানীদের মাঝে।

চোখে চোখ মিলল। হাসিতে সারা মুখ ঝলমল। তিমিরের টেবিলের দিকে বরাবর এগিয়ে এল মনীষা।

—দেখতে এলাম। যাচ্ছিলাম এদিক দিয়ে। কেমন কাজ চলছে?

মনীষার খাপছাড়া প্রশ্নে কী উত্তর দেবে ভেবে না পেয়ে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু। কেরানীদের চোখ ঘুরছে, বড়বাবু তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন তার দিকে। তিমিরের মনে হল: একি মনীষার নতুন নিষ্ঠুরতা, নতুন ধরনের কায়দা।

মনীষা বললে, কাজ তো কম নয় দেখছি। কত দেরি হবে?

—দেরি হবে। তিমির ঘাড় হেঁট করে বললে।

—কিন্তু, আমার তো সময় নেই দেরি করবার। ছুটি নাও না··· কথা আছে।

—ছুটি!

—হ্যাঁ। আমি বাইরে গাড়িতে অপেক্ষা করছি। জলদি এস।

জুতোর শব্দ তুলে বেরিয়ে গেল মনীষা।

মুখ বুজে পাথরের মতো বসে রইল তিমির। তার চোখের সামনে যেন সমস্ত অফিস-ঘরটা দুলছে, আর এতগুলো মানুষের জিজ্ঞাসা-কুটিল চোখ যেন তার দিকে উদ্যত হয়ে রয়েছে।

বড়বাবু ছুটে এসে বললেন, কী, কী বললেন উনি, এঁ্যা?

—না কিছু নয়।

টেবিল গুছিয়ে উঠে দাঁড়াল তিমির। তারপর ওদের বিস্মিত দৃষ্টির সামনে দিয়ে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে গেল সে।

—এস—এস। ড্রাইভারের সাটে বসে ঘন ঘন হর্ন বাজাতে লাগল মনীষা।

তিমির মোহগ্রস্তের মতো উঠে বসল গাড়িতে।

গাড়ি ছুটল।

সোজা রাজমহল রোড ধরে। স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে সামনে দৃষ্টি ছড়িয়ে মনীষাই হাসল প্রথম। —খুব নাটকীয় হয়ে গেল ব্যাপারটা, না?

তিমির মূক।

—তা হক। গদ্যময় জীবনে একটু নাটকের মশলা থাকা দরকার, কী বল?

তিমির মূক।

কী বলবে? বলবে: এই নাটকের মধ্যে তাকে একেবারে

হাস্যকর কাটাসৈনিকের ভূমিকায় ফেলে না দিলে ঢের বেশি সম্মান দেখাতে পারত মনীষা। মনীষা কি চায়!

অতগুলো লোকের সামনে তাকে এইভাবে অপদস্থ করার কি অর্থ থাকতে পারে। নাকি প্রতিশোধ নিচ্ছে সে। কর্তালির সস্তা মোহ! আর ভাবতে পারছে না তিমির। আগামীকাল আপিসের কানাঘুষো হাসাহাসিতে কান পাতা দায় হবে। আর তিমিরের চাকরি পাবার আসল রহস্যটুকুও এবাব জলের মতো স্বচ্ছ প্রতিভাত হবে তাদের কাছে।

মনীষা কেন এমন করল?

গাড়ি এসে থামল মহানন্দার ভাসমান ব্রীজের কাছে। আস্তে আস্তে গাড়ি চালাল মনীষা। হ্যাঁ, ব্রীজের পরেই উঠে পড়েছে গাড়িটা। মহানন্দার স্রোত বিকেলেব রোদে ইলসেব আঁশেব মতো ঝিকিয়ে উঠছে।

মনীষা হাসল ফের।—একটু এদিক-ওদিক হয়ে গেলেই এই ব্রীজ থেকে গাড়িশুদ্ধ আমরা জলে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারি।

তিমির বললে, সেটা কি খুব কষ্টের হবে?

—মানে···। শুভ্র দাঁতের সারি ঝিকিয়ে উঠল মনীষার।

তিমির বললে, না। কিছু নয়।

—রাগ হয়েছে দেখছি। মনীষা হাসল।—রাগলে তোমাকে ঠিক আগের মতোই দেখায়। কি গো, মৌনী তাপস হয়ে গেলে যে, কথা বলবে না বুঝি?

—তোমার উদ্দেশ্য তো সিদ্ধ হয়েছে। তোমার ক্ষমতার তুমি পুরোপুরি ডেমোনস্ট্রেশন করতে পেরেছ। আর কি চাও, বলতে পার কি চাও তুমি আমার কাছে? তিমিরের গলায় উত্তেজনা।

গাড়ি সড়কে উঠল। তারপর এঁকে বেঁকে ছুটতে লাগল।

তিমির আবার বললে, কোথায় যাওয়া হচ্ছে জানতে পারি কি?

মনীষা কানের ঝুমকো নাড়িয়ে জানাল, পার না।

তিমির মূক।

মনীষা বললে, মাস্টার মশায়, হিসেব এখনো ছাড়তে পারলে না? কবি বলেছেন, 'কী পাইনি তার হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি...'। খিলখিল করে হাসিতে ফেটে পড়ল মনীষা। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললে, তুমি কিন্তু আর আগের মতো হাস না।

তিমির চুপ করে রইল।

মনীষার মুখের ওপর কয়েকটা চুল উড়ছে, শাড়ির লাল আঁচলটা তিমিরের কাঁধে এসে পড়ছে। আর বিকেলের গৈরিক আলোয় ওর রঙ-করা মুখটা যেন তেমন উগ্র দেখাচ্ছে না।

মনীষা বললে, আচ্ছা ফাঁসির আসামীর মতো মুখটা করে আছ কেন? আহা, দেখই না গো আমার মুখের দিকে চেয়ে। সেদিন যেমন করে তাকাতে।

তিমির ওর চোখের দিকে তাকাতে গিয়ে যেন চোখ ফেরাতে পারল না। মনীষার চোখ দুটো কাজলকে হারমানানো কালো আর গভীর। উপমাটা বাজে হলেও মনে না পড়ে পারল না: একদিন চৌধুরীদের আমবাগান দিয়ে যেতে-যেতে একটা গরুর চোখে এমন গভীর ক্লান্তির ছায়া দেখেছিল সে।

গাড়ি এসে থামল আদিনা দুর্গের ধ্বংসস্তূপের সামনে।

এক প্রাগৈতিহাসিক জন্তুর বিরাট খোলসের মতো হাঁটুভেঙে পড়ে আছে বিরাট দুর্গটা। অনাদরে বর্ধিত পুরু ঘাসের সবুজ আচ্ছাদনের মধ্যে কালো পালিশ করা ভারি পাথরগুলো স্ফিংসের মতো প্রস্তর-স্বপ্ন দেখছে। কবরের মতো বিষণ্ণ জড়তা আচ্ছন্ন করে রেখেছে এর পারিপার্শ্বিক। মাটির ওপর মুখ থুবড়ে পড়া পাথরগুলোর পিঠের ওপর দিয়ে একটু এগলেই খিলান দেয়া নাচঘর...জাঁকজমক আড়ম্বরের মধ্যযুগীয় চিহ্ন আজো পুরনো দেয়ালে খোদিত রয়েছে। বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের তৈরী কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা যায়। ভেতরে

দু-মাইল কম্পাউণ্ড···চোরকাঁটা আর ফনিমনশার ঝোপে ভরতি। কম্পাউণ্ডটার চারিদিক উঁচু দুর্গ প্রাকারে জড়ানো। দর্শক এসে পুব-দিকের দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়ায়—যার গায়ে বিখ্যাত বিদ্রোহী জিতু সাঁওতালের সিংহাসনের ভগ্ন দশা···যেখান থেকে জিতু তার সাঁওতাল ফৌজ নিয়ে ব্রিটিশ ফৌজের সঙ্গে লড়াইয়ের পরিকল্পনা করেছে। সে-কাহিনীর রোমাঞ্চ আজো ম্যালেরিয়া-জর্জর হাড়-ডিগডিগে বংশধরদের রক্তে পচাইয়ের উগ্র জ্বালা ধরিয়ে দেয়। তিনদিন তিনরাত ধরে এক নাগাড়ে চলল সেই লড়াই। প্রাচীরের বাইরে জবরদস্ত কালেকটার তালুকদার সাহেব আর দু-শ সিপাই, ভেতরে সাঁওতাল বাহিনী—বিষমাখা তীর—আদিম হাতিয়ার আর উন্নত অস্ত্রের চলল তীব্র লড়াই। বুলেটের দাগে বসন্তের ঘায়ের মতো ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠল দেয়াল আর প্রাচীর। গুলি খেয়ে মরল সাঁওতাল, ওদের অব্যর্থ তীরের শিকারে নীল হয়ে গেল ফৌজদের বুক। অবশেষে শিস দিয়ে আগ্নেয় মৃত্যুর মতো এল এক বুলেট, ছেঁদা করে দিয়ে গেল সেনাপতি জিতুর হৃৎপিণ্ড। ঐ শেষ বিদ্রোহ। তারপর থেকেই জায়গাটা নখদন্তহীন জরদ্গব সিংহের মতো যেন পীড়াদায়ক রকমের শান্ত হয়ে উঠেছে। কবরের শান্তি।

দুর্গের ওপারেই ডাক বাঙলো। বহুদিন অব্যবহৃত, অনাদরে পড়ে রয়েছে। লোকে বলে ঃ আদিনা ডাক বাঙলো। দুর্গ আর ডাক বাঙলোর মাঝামাঝি চওড়া পেড়ে শাড়ির মতো ধূলো বোঝাই ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের সড়ক। সোজা দৌড়েছে গাজোলের দিকে।

গাড়ি থেকে নামল দুজনে।

ভাঙাচোরা পাথরগুলো পায়ে পায়ে মাড়িয়ে চলতে-চলতে তিমির বললে, তোমার কাজের কথাটা কি ?

মনীষা এক হাতে কাপড় গুছিয়ে নিয়ে সামনের পাথরটায় লাফাতে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। হেসে বললে, এতক্ষণ পরে সে-কথাটাও নতুন করে বলতে হবে।

তিমির অসহিষ্ণু হয়ে বললে, হবে বইকি। জীবনটা তোমার ওই নাচের মুদ্রা নয় যে আভাসে ইঙ্গিতে তাকে রূপ দেবে।

মনীষা গম্ভীর হয়ে বললে, এস না আত্মহত্যা করি।

তিমির ততোধিক গম্ভীর গলায় বললে, আত্মহত্যা। কেন? কিসের দুঃখে?

—মরে গিয়ে যদি নতুন করে বাঁচা যায়। ধর আগামী জন্মে তুমি হলে রাখাল আর আমি পথের ঘাস। তুমি বাঁশি বাজিয়ে আমার তৃণশয্যার বুকের ওপর দিয়ে হেঁটে চলে যাও, আর তোমার পায়ের ছন্দে আমার ঘাসের ইচ্ছাগুলো নূপুর হয়ে বাজে।

—তুমি আস্ত পাগল। সত্যি করে বল কী হয়েছে তোমার?

মনীষা নাটমন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে বললে, আমি ক্লান্ত, ভীষণ ক্লান্ত তিমির। মনে আছে তোমার সেই কবিতা: যদি ক্লান্তির পাহাড় ডিঙিয়ে তোমার সূর্যলোকে পৌঁছতে না-পারি, তবে ক্ষমা করো, ক্ষমা করো মানুষের অক্ষমতার লজ্জায়…। মনে পড়ে তোমার?

—না।

—পড়ে না, না স্বীকার করতে চাও না।

ঘাসের পুরু গালিচার ওপর বসল দুজনে।

অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছিল মনীষাকে। ঘন ঘন হাই তুলছিল, কনুইয়ের ওপর ন্যস্ত করেছিল দেহভার, বিস্রস্ত বসন কাঁধ থেকে আলগা হয়ে গড়িয়ে পড়েছে ঘাসের ওপর।

—একী। তোমার গা যে পুড়ে যাচ্ছে মনী….মনীষা…

—আবার বল মনী…মনীষা.., বিড়বিড় করে বললে মনীষা।

—সত্যি, তোমার ভীষণ জ্বর হয়েছে।

—হয়েছে—হয়েছে—হয়েছে। ভীষণ জোরে মাথা ঝাঁকাল মনীষা।—কী করতে পার তুমি? পার ওই পাথরের চুড়ো থেকে লাফিয়ে পড়তে, হাত ধরাধরি করে মৃত্যুর অত্যাচারের হাতে নিজেদের

চূরমার করে দিতে। একই আগুনে পুড়ছি আমরা—তুমি দারিদ্র্যের আমি ধনের। খিলখিল করে হেসে উঠল মনীষা, সেই হাসির আওয়াজে শাখাভ্রষ্ট শালিকটা শব্দ করে আকাশে উড়ে পালাল। হাসি থামিয়ে মনীষা আবার বললে, ভয় পেও না অঙ্কের মাস্টার। আমি কথার কথা বলছিলাম। আচ্ছা তিমির ?

—বল ?

—তোমার মনে পড়ে সেই কবিতাটা, তুমি অনুবাদ করে আমাকে উপহার দিয়েছিলে। সেদিন ব্যাগ হাতড়াতে গিয়ে পেলাম লেখাটা। কি যেন ?

'সন্দেহ করো : নক্ষত্রে আগুন আছে
সন্দেহ করো : সূর্যের গতিবেগকে
সন্দেহ করো : সত্য মিথ্যারই ছদ্মবেশ
সন্দেহ করো না : আমি ভালোবাসি।'

মনীষার একটা হাত তিমিরের কোলের মধ্যে যেন সেদিনের আশ্রয়কে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছে। তিমির পাথরের মতো স্থির।

—চল না তিমির, পালিয়ে যাই কোথাও। ছোট্ট একফালি গোবর নিকানো আঙ্গিনা, চালে লাউয়ের ডগা, পদ্মপুকুর থেকে আমি আনব জল, তুমি আসবে মাঠের কাজ সেরে, তোমার গায়ে কালো-মাটির সোঁদা গন্ধ, আমি ভিজে আঁচল দিয়ে তোমার শরীরের খেদ আর গ্লানি দেব মুছিয়ে, মাদুর পেতে সন্ধ্যাদীপ জ্বালিয়ে বসব ঝিঁঝি ডাকা আঙ্গিনার তলায়, তুলসীমঞ্চে প্রদীপের ভীরু শিখা কাঁপবে থরথর করে আর আকাশে জ্বলবে তারাদের চোখ, দূরের থেকে ভেসে আসবে শেয়ালের ডাক, কি মসজিদের আজানের সুর, ঘুম ভাঙা পাখির কলকণ্ঠে আমাদের রাত্রি নামবে, ঘুম নামবে, ঘুম-ঘুম, আঃ...। তিমিরের কোলে মাথা রেখে যেন ঘুমেরই অতল সমুদ্রে তলিয়ে গেল মনীষা।

—মনী—মনীষা…। ডাকতে গিয়ে থরথর করে কেঁপে উঠল তিমিরের কণ্ঠস্বর।

পশ্চিমাকাশ লাল হয়ে উঠেছে। সমস্ত স্থানটা নির্জন থেকে নির্জনতর।

গোধূলির ছেঁড়া মেঘ থেকে এক টুকরো আলো এসে পড়েছে মনীষার মুখে, তার বোজা চোখে, চোখের কোলে যেখানে কালি পড়েছে।

অনেকক্ষণ পর যেন ঘুম থেকে উঠল সে। জ্বরের ধমকে আরো লাল দেখাচ্ছে ওর মুখটা। আর গম্ভীর, থমথমে।

ফেরার পথে অনেক পুরনো প্রশ্ন উকিঝুঁকি মারছিল তিমিরের মনে, কিন্তু মনীষা অত্যন্ত গম্ভীর আর নীরব। এখন হঠাৎ মনে হল তিমিরের, এবার যদি সত্যিসত্যিই ব্রীজ থেকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে তারা গাড়িশুদ্ধ মহানন্দার জলে তাহলে বোধ হয় খুব কষ্ট হবে না।

বিছানায় শ্রান্তিভরা চোখ মেলে পড়ে থাকে সুলতা। দেহ জুড়ে ক্লান্তির ঘাম নামে, ঘুম নামে না চোখের পাতায়। কয়েকদিন থেকে আবার পুরনো দুশ্চিন্তাটা মনের উপর গাঢ় ছায়া ফেলেছে। প্রায় মাসটাই শেষ হয়ে এল, কিন্তু একি হল। শরীরের মধ্যে যেন কেমন এক অদ্ভুত গুমট, ঝড়ের আগে থমথমে বিশ্বপ্রকৃতির মতো। নিজেকে চিনতে কষ্ট হয়—দেহে মনে যদিও একটা নতুন জোয়ারের টান এসেছে তবু সেই টান কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে তাকে, কে জানে।

মাকে বলেনি সুলতা : সেদিন ভাত খেয়ে উঠেই হুড়মুড় করে ছুটে গেছে স্নানের ঘরে, হড়হড় করে বমি করে ভাসিয়ে দিয়েছে। কদিন থেকে খেতে অরুচি। ভাতের থালার কাছে বসলেই কান্না আসে।

ভয় ভয় ভয়। কেবলি ভয়ের প্রেতটা পিছু ধাওয়া করে বেড়ায়। যদি—সত্যিই, মাগো, আর ভাবতে পারে না সে।

ঘুম আসছে না, আসছে না কিছুতেই।

দুধের মতো শাদা জ্যোৎস্নার দিকে অনিমেষে চেয়ে ঘোর লাগে সুলতার। জানলার গরাদ ধরে অনেকক্ষণ বেহুঁশ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক দুই তিন—ফোঁটায়-ফোঁটায় রাত্রির ভাণ্ডারে মুহূর্তগুলি জমতে থাকে। রাত্রির বয়েস বাড়ে।

দরজা খুলে ভেতরের বারান্দায় এসে দাঁড়াল। এখান থেকে সৌরেশের ঘর দেখা যায়। সে কি জেগে রয়েছে। না অকাতরে ঘুম দিচ্ছে।

পা টিপে টিপে সৌরেশের ঘরে এসে ঢুকল সুলতা।

মৃদু বাতির আলোর ক্ষীণ আভাটুকু জ্বলছে। ঘরের মধ্যে আলোছায়ার আলপনা।

সৌরেশের বিছানার ওপর খোলা জানলার জ্যোৎস্না আটকে পড়েছে। প্রার্থনার ভঙ্গীতে বুকের ওপর হাতজোড় করে ঘুমচ্ছে মানুষটা। ভারি নিশ্বাসের আওয়াজ। ওর মাথার দিকে মুগ্ধের মতো বসল সুলতা। ধীরে ধীরে ওর নরম চুলে হাত বুলিয়ে দিতে লাগল...ওর চোখ, ভুরু, প্রশস্ত ললাট। আর ঘুমন্ত লোকটাকে কী-অসহায় করুণ দেখাচ্ছে। ভাবলে মজা লাগছে সুলতার, কি-ভয়ংকর এই পুরুষগুলো জেগে থাকলে। এক-একটি লোভী, অত্যাচারী, ইতিহাস-বিখ্যাত রাজা যেন। তখন ভয় করে ওদের চোখের দিকে চেয়ে।

সৌরেশকে জাগিয়ে দিতে লোভ হচ্ছে। তার চোখ থেকে সব ঘুম কেড়ে নিয়ে কি-বাহাদুরের মতোই ঘুম দেওয়া হচ্ছে। নাঃ তবু জাগিয়ে দেবে না ওকে। আজ এই রাত্রে একলা সম্ভোগের আনন্দ সুলতার। আজ এই নির্জন অবসরে তার সমস্ত মন যেন

পুরুষ হয়ে গেছে। জ্যোৎস্নার উলঙ্গ লজ্জা তাকে আটকাতে পারে না।

কতক্ষণ কেটে গেছে, খেয়াল নেই।

উঠে দাঁড়াল সুলতা। পা টিপে টিপে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই হঠাৎ ভূত দেখে আঁতকে উঠে থমকে দাঁড়াল সে।

—খুকী! ক্রুদ্ধ মার্জারের মতো ঘড়ঘড় করে উঠলেন সৌদামিনী।

মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল সুলতা।

—মুখপুড়ি, সর্ব্বনাশী মেয়ে তোর জ্বালায় কি আমরা গলায় দড়ি দেব।

সুলতা মূক।

—এতই যদি বলতে পারিস না ছোঁড়াটাকে বিয়ে করতে।

—মা···। সুলতা আর্তনাদ করে উঠল।

তিমিরের ঘুম ভেঙে গেল। ঘুম ভাঙা কর্কশ গলায় জিগ্যেস করল, কি হয়েছে মা?

সৌদামিনী চাপা ক্রোধে গর্জন করে উঠলেন, হয়েছে আমার মাথা আব মুণ্ডু। দেখ তোমার গুণধরী বোনের কীর্তি। ছি ছি, এমন মেয়েও পেটে ধরেছিলাম···। গশ গশ করতে করতে তিমিরের ওপর সব বিচারের ভার দিয়ে ঘরে চলে গেলেন তিনি।

এই ধবল জ্যোৎস্না আর সুন্দর রাত্রে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল সুলতা। মা ধরিত্রী দ্বিধা হও। লজ্জা ভয় অপমানে মৃত্যুকেই শ্রেয় মনে হল তার।

—কি হয়েছে রে সুলতা? তিমির বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করল।

সুলতা মূক। ফ্যাকাশে বিবর্ণ মুখের চেহারা। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দনটুকুও ধরতে পারছে না। এই জ্যোৎস্না, এই রাত্রি, এই পৃথিবী—এসব কি সত্যি? সত্যি?

তিমির কি মনে করে থেমে গেল। শুধু বললে, আজ রাত্তির হয়ে গেছে। যা শো গে। কাল সকালে সব শুনব।

স্থলতা টলতে-টলতে ঘরে চলে গেল।

বিছানার ওপর ধপ করে এসে বসল।

চেতনাহীন, অনুভূতিহীন—গায়ের ওপর দিয়ে জগন্নাথের রথ চলে গেলেও বোধকরি বিচলিত হবে না সে। ভয় কাকে করবে, কেন? ভয়ের চেয়ে তার হৃদয় অনেক বড়, ভালোবাসা অনেক বড়। সৌরেশ তাকে বিয়ে করবে। যদি এখানে জায়গা না হয় চলে যাবে দূরে কোথাও, দূরে, অনেক দূরে। যেখানে দুজনে নবীন আশ্বাসে নতুন ঘর গেঁথে তুলবে, আকাশ আর মৃত্তিকা···

কিন্তু, ঘুম আসছে না কেন?

দূরের ট্রেজারির ঘড়িতে রাত্রি দুটোর ঘোষণা। এ-রাত্রির শেষ হবে কবে।

ফিনিক দিয়ে জ্যোৎস্না ফুটেছে।

স্থলতার দীর্ঘশ্বাস রাত্রির হাওয়ার সঙ্গে মিশে গেল।

বিনয় আর কমলার বিবাহ অনুষ্ঠানের পর প্রীতিভোজ খেয়ে বিদায় নিল তিমির। অদ্ভুত লাগল যৌবন-পার-করে-দেয়া এই দুটি মানুষের যৌবন-কামনা দেখে। স্নিগ্ধ নয়, রূঢ় কর্কশ, তবু সহজ-স্বাভাবিক। বিবাহ বস্তুটির পেছনে তথাকথিত মরিয়া রোমান্সের ইন্দ্রজাল রচনা করবার দুর্মর প্রচেষ্টা নেই। যা হবার, যা হওয়া উচিত ছিল তাকে সুস্থ বিনাদ্বিধায় বরণ করে নিল তারা।

রোগা কৃশাঙ্গী মলিন মেয়েটি, খর্ব চোখে জোরালো পাওয়ারের চশমা। চুলে নেবুতেলের গন্ধ নেই, প্রসাধনে নেই বসন্ত-বাহার। হাতে চারগাছা রুলি, গলায় পাতলা সোনার হার, কানে দু-আনার সোনা। সীমন্তে গাঢ় করে টেনেছে সিঁদুরের রেখা। নিসংকোচ হাসি-ছাওয়া মুখ।

বিনয়ের গায়ে গরদ নয়, মোটা খদ্দরের পাঞ্জাবী, তাও দুদিন

আগের ভাঁজ-ভাঙ্গা, চিরদিনের সাজ, নতুনের মধ্যে দাড়ি কামিয়েছে, চুল ছাঁটবার সময় পায়নি।

সস্তা মুর্শিদাবাদি সিল্কে ঘোমটা-টানা কমলাকে বাতির আলোকে কোমল আর নরম দেখাচ্ছিল। বিয়ের নিয়মে যতটুকু আটকা থাকতে হয়েছিল, তারপরেই ঘুরতে দেখা গেল তাকে রেকাবি হাতে অতিথিদের আপ্যায়ন করতে।

বাইরে থেকে বাড়তি কি-আর শুভেচ্ছা জানাবে তাদের! জীবনকে ওরা অনেক ভালো করে জেনেছে দেখেছে বুঝেছে, অর্থহীন স্বপ্নের শেওলা নেই ওদের চোখে, ওরা দুঃখ-দারিদ্র্যের পায়ে তথাস্তু জানিয়েই নেমে পড়েছে জীবনের পথে।

পথ চলতে-চলতে নিজের জীবনের ভগ্ন বঞ্চিত দিকটাই কালো নিশানের মতো ঝুলতে লাগল তিমিরের চোখে।

অস্বাভাবিক গলায় চিৎকার করে উঠতে ইচ্ছে করছে, এই কি জীবন···এরই জন্যে পৃথিবীতে আসা, বেঁচে থাকা আর একদিন দপ্ করে নিবে যাওয়া।

ঘৃণায় বিতৃষ্ণায় রী রী করে ওঠে মনের ভেতরটা। এক-একসময় মনটা স্বার্থপর সংকীর্ণ হয়ে আসে। যেখানে একটিমাত্র মানবী আর তাকে ঘিরে গুনগুনিয়ে ওঠা। যাক বিশ্ব রেণু রেণু হয়ে। 'আমরা দুজনে ভাসিয়া চলেছি যুগল প্রেমের স্রোতে।' মনীষা! আদিনা দুর্গের চত্বরে সেই সান্ধ্যরজনীর স্মৃতি মনে পড়ে। মনীষার জ্বর হয়েছিল, কিন্তু সবই কি জ্বরের প্রলাপ। মনীষা!···সে-এক দুঃস্বপ্ন, বাজে মিথ্যা অতীত।

হাসি পায় তিমিরের। বাস্তব পৃথিবীতে ঠোকর খেয়ে চেতনা থেঁতলে যায়। পঙ্গু অসাড় হয়ে আসে বোধশক্তি। তার আজকের পৃথিবী মুদ্রার মুকুরে অঙ্কিত হয়ে গেছে, সেখানে আর কারুর মুখ নেই, একমাত্র সম্রাটের মূর্তি। টাকা চাই। আরো, আরো টাকা। মোটা সুখ, মোটা জীবনের লালসা ধুকপুক করে রুগ্ন শিশুর মতো।

কদিন থেকে বাবার অসুখ। ওষুধ, পথ্যি, বিশ্রাম। রোজকার চাল-ডাল-নুন। বাড়িতে পা দিয়ে আর নতুন কিছু চিন্তা করার থাকে না। বাঁচো—বাঁচো—বাঁচো। সংসার-সংগীতের একটিমাত্র ধুয়া।

আজকের পৃথিবীতে তবু যে মানুষ কি করে রোমান্টিক থাকে সেইটেই আশ্চর্যের। চোখ বুজে থাকলেই যদি সব কিছু মিথ্যা হয়ে যেত!

সন্ধ্যের মধ্যেই টাকা যোগাড় করতে হবে। ডাক্তারের ব্যবস্থা মতো ওষুধ কেনা দরকার।

ত্রাহি মধুসূদন একমাত্র জগদীশ। সুষমার মৃত্যুর পর সে নতুন বিয়ে করেছে—তারপর আর দেখা করেনি ওর সঙ্গে। কেননা ভালো লাগত না। মনে হত সুষমার পবিত্র স্মৃতি ওই বাড়িতে প্রতিনিয়ত ধিক্কৃত হচ্ছে।

তবু গরজ বড় বালাই। যেতে হবে টাকার জন্যে।

জগদীশ বন্ধুকে দেখে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বললে, যাক। তাহলে ভুলিসনি একেবারে। আয় ভেতরে আয়। ললিতার সঙ্গে আলাপ করে দি—।

সেই পুরনো সুরে সেই পুরনো দিনের মতোই ওর স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত করে দিতে চাইল সে। অবাক হয়ে জগদীশের চাল চলন লক্ষ্য করছিল তিমির। সুষমার অস্তিত্বের কোনো রেশই অবশিষ্ট রাখেনি বাড়ির মধ্যে। আশ্চর্য! মন থেকেও কি করে মুছে ফেলেছে বেমালুম। পাত্রান্তরে যেন অরুচি নেই জগদীশের, ওর পিপাসা মিটলেই হল। সুষমার সন্তানটিকে নাকি শাশুড়ীর তত্ত্বাবধানে ছেড়ে দিয়েছে।

চমক লাগল তিমিরের ললিতাকে দেখে। কি অদ্ভুত সাদৃশ্য সুষমা আর ললিতা দুই বোনের। চায়ের পেয়ালা হাতে ললিতা

যখন এগিয়ে এল তখন বিস্মিত হতবাক হয়ে পড়েছিল সে। চোখ-মুখ গায়ের রঙ, শরীরের হুবহু আদল—যেন সুষমারই নির্দোষ অনুকরণ।

ললিতা চা দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতেই জগদীশ আত্ম-প্রত্যয়ের হাসি হেসে বললে, আমার রুচিবোধকে নিশ্চয়ই তারিফ করবি। ললিতাকে কেমন দেখলি ?

তিমির বললে, ভালো।

জগদীশ দার্শনিকতার সুরে বললে, সুষমাকে আজো ভুলতে পারিনি ভাই। ললিতার দেহে আমি ওর আত্মাকে খুঁজে পাই।

তিমির বিদ্রূপ করে বললে, তাই বুঝি ঘর থেকে সুষমার ফোটো-খানাও অদৃশ্য করে দিয়েছ। ওতে বুঝি আত্মা অনুসন্ধানের বিঘ্ন ঘটে।

জগদীশ আহত হবার চেষ্টা করে নরম গলায় বললে, ঠাট্টা করছিস ? কিন্তু কি করব ভাই, ললিতা সুষমার কোনো ফোটো বাড়িতে রাখতে দিতে চায় না। বাচ্চাটাকে পর্যন্ত ওর মার কাছে রেখে আসতে হয়েছে। ভাই-ভাই এত ঈর্ষা করে কিনা জানিনা, কিন্তু এদের সহোদর বোনের মধ্যে এত হিংসা কল্পনা করিনি।

তিমির বললে, ললিতার অজুহাত দেখিয়ে নিজের অপরাধ লঘু করবার চেষ্টাকে প্রশংসা করি, কিন্তু তোমার কথার ওপর আমার বিন্দুমাত্র আস্থা রাখতে পারছিনে। ক্ষমা করো।

জগদীশ বললে, জানি আমাকে তুই বিশ্বাস করবি নে। যাকগে পচা অতীতটা। বল্, তোর খবর বল্ ?

তিমির বললে, আমার কোনো খবর নেই। যাকে বলে নিঃসংবাদ দেউলে হয়ে বসে আছি। বাবা ভুগছেন অসুখে। মাসের শেষ। কিছু টাকা চাই।

—টাকা! মুশকিলে ফেললি দেখছি····

—টাকা নেই ? তাহলে···

—নেই তোকে বলি কি করে? মুশকিলটা অন্যখানে। কী জানিস: বিয়ের পর থেকে দেরাজের চাবি ললিতার আঁচলে। টাকা খরচ করার ব্যাপারে ওর ভীষণ কৃপণতা। নিজের জরুরী প্রয়োজনেই টাকা বের করতে কম সাধ্যসাধনা করতে হয় না। ওর ধারণা: পুরুষরা ঘরে টাকা আনবে আর তার ওপর শক্ত পাহারা বসাবে মেয়েরা। পুরুষমানুষের হাতে টাকা থাকলে নাকি চরিত্র খারাপ হবার নিশ্চিত সম্ভাবনা।

তিমির বিরক্ত গলায় বললে, তোমার দাম্পত্য নাটক শুনতে আমার এতটুকুও ধৈর্য নেই। দয়া করে বল টাকা দিতে পারবে কিনা।

জগদীশ বললে, আহা, চটছিস কেন? দাঁড়া—কিছু ব্যবস্থা করা যায় কিনা দেখি।

—দয়া করে তাই দেখ।

—কত টাকা চাই?

—অন্তত গোটা তিরিশ-চল্লিশেক……

জগদীশ উঠে ভেতরে চলে গেল।

টাকা নিয়ে এসে বললে, আচ্ছা কি হয়েছে তোর বল্‌তো? এমন উত্তেজিত তো তোকে কোনোদিন দেখিনি।

তিমির ম্লান হেসে বললে, বেঁচে আছি প্রমাণ করবার জন্যেও যে উত্তেজিত হওয়া দরকার জগদীশ। কিছু মনে করো না। চলি।

ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল তিমির।

দিন গড়িয়ে চলল।

আবার নতুন বছর। বৈশাখের লেলিহান চিতাশয্যায় বসন্ত পুড়ে মরল।

গম্ভীরা-গায়ক গান ধরল ঃ

বুলব কি হে বুঢ়া নানা,
ইবার বুঝি আর বাঁচে না জান।
গাছে গাছে ঢুড়্যা দেখছি
লতুন পাতা সব সমান।
ও শিব, কলিকালে ই-কি তুমার লীলাখেলা
ভাব্যা হইলাম হালাকান।
মনে মনে ভাবছি বস্যা, কামের কুন নাই যে দিশা,
ত্যাল ধান চাউলের বাজার কশা,
ভুষার বেশি দাম।
তুমি না বাঁচলে আর বাঁচে না
হামাদেরই পরান।
শিব হে··········

দিনগুলি অত্যন্ত বিশ্রীভাবে কাটতে লাগল।

চণ্ডীচরণের অসুখ কমবার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। ডাক্তারের ফি আর ওষুধের খরচ মেটাতে-মেটাতে দেনার পাহাড় জমতে লাগল। ডানে-বাঁয়ে বন্ধুবান্ধব কারুর কাছেই হাত পাততে বাদ রাখল না তিমির। কিন্তু, একদিন ধার দেবার লোকেরও অভাব দেখা দিল। একবার যাদের কাছে ধার করল দ্বিতীয়বার তাদের দ্বারস্থ হবার মুখ রইল না।

বন্ধুরা তার দৃষ্টিপথ থেকে সরতে লাগল। এমন কি জগদীশ পর্যন্ত তার উপস্থিতিকে নিদারুণ ভয়াবহ চোখে দেখতে লাগল।

ভাবনা-চিন্তায় পাগল হয়ে যাবার কথা তিমিরের। কিন্তু, কি করে পাগল হয়। লোকনিন্দা আছে। পিতৃ ঋণ শোধ করতে হবে।

সন্ধ্যাবেলায় ক্লান্ত ঘর্মাক্ত শরীরে বাড়ি ফিরল সে।

সুলতা বললে, দাদা একি চেহারা হয়েছে তোমার।

তিমির গুম হয়ে বসে রইল।

—তোমাকে একটু হাওয়া করে দেব?

—কেন বাজে বকছিস। আমাকে একটু একলা থাকতে দে। বিরক্ত হয়ে বললে তিমির।

মুখ কালি করে বেরিয়ে গেল সুলতা।

বিছানায় চিত হয়ে পড়ে রইল তিমির। মাথার ওপরে ছাতা-ধরা কড়ি কাঠ। এর চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। হাওয়া নেই এক ফোঁটা। নিত্য শুধু জীবনের অবক্ষয়।

কি যেন প্রশ্নটা?

টাকা চাই।

হঠাৎ একটা আশার ঝলক।

—মা—ওমা শুনছ—। তিমির ডাকল।

—কি, বলছিস কি? সৌদামিনী এসে দাঁড়ালেন।

—টাকা যোগাড় করতে পারলাম না মা। অথচ ডাক্তার······ তিমিরের গলায় অসহায় কাতরানি।

—তা, আমি কি রোজগার করতে বেরুব বাপু?

মার গলার স্বর শুনে চমকে উঠল তিমির। এই কি সংসার! এরই জন্যে জীবনের অপব্যয়। কি প্রয়োজন এই মূল্যহীন খেলো অস্তিত্বের। ফাঁদে- আটকা পড়া মাছির মতো ছটফট করতে থাকে। সমস্ত সংসারটা রুক্ষ মরুভূমি হয়ে উঠেছে, কোথায় হাত পাতবে সে, কোথায় মেলে ধরবে তার তপ্ত হৃদয়ের জ্বালা।

—কি বলতে চাস পস্ট করে বল্ দেখি। সৌদামিনীর গলায় সংশয়।—বিনা চিকিচ্ছেয় মানুষটা মারা যাবে নাকি।

—আমি বলছিলাম—। তিমির ঢোঁক গিলে বললে, তোমার কয়েকটা গহনা যদি···

—কী, কী বললি? ছেলে হয়ে তোর মুখে এই কথা! আমার গহনার কথা মুখ ফুটে উচ্চারণ করলি তুই। এর চেয়ে আমার

মরণ হল না কেন। চোখে আঁচল দিয়ে কান্না শুরু করলেন সৌদামিনী।

অবাক বিহ্বল তাকিয়ে রইল তিমির মার দিকে। স্বামীর জীবনের চেয়ে বড় হল গহনার দাম। গহনা-বিলাসী মায়ের মনের স্বার্থপর চেহারাটা দেখে আঁতকে উঠল সে।

সৌদামিনী নাকী কান্নায় ইনিয়ে বিনিয়ে বললেন, কেন, কেন আমি গহনা দেব। ওঁর অবর্ত্তমানে আমাকে কে দেখবে, কে আমাকে খাওয়াবে। ভবিষ্যতের ওই সম্বলটুকু খুইয়ে আমি কি পথে দাঁড়াব।

—মা··· চিৎকার করে উঠল তিমির ঘৃণায়। কি একটা শক্ত কথা বলতে গিয়ে থেমে গেল। ভরদ্বাজ ঋষির কাছে ভরত এইভাবে তাঁর জননীর পরিচয় দিলেন: ইনি অযোধ্যার রাজলক্ষ্মীকে বিদায় করে এসেছেন, ইনি পতিঘাতিনী ও সমস্ত অনর্থের মূল, বৃথাপ্রজ্ঞামানিনী ও রাজ্যকামুকা—এই ছুভাগার মাতা। বলতে-বলতে ভরতের ছুচোখ অশ্রুপূর্ণ, ক্রুদ্ধ সর্পের ন্যায় একবার জল-ভরা চক্ষে মাতার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন।·······

সৌদামিনী তখনো বিড়বিড় করে চলেছেন।—আমার বাপ মার-দেয়া গহনা, আমি কিছুতেই লোকসান করতে পারব না, কক্ষনো না। দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেলেন তিমিরের সুমুখ থেকে, যেন সে জোর করে ছিনিয়ে নেবে গহনাগুলো।

বেদনাহত নির্বাক বসে রইল তিমির। পৃথিবীতে অনেক রকম নিষ্ঠুরতা নানারূপ ধরে তাকে বিধ্বস্ত করবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু মার ব্যবহারের নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই।

কাদের জন্যে খাটছে সে পৃথিবীতে। কেন যৌবনের সমস্ত শক্তির বাজে খরচ। কি দিয়েছে আর বিনিময়ে কি পেয়েছে সে। এই কি সংসার? না অরণ্য। মস্তিষ্কের মধ্যে সহস্র কামান গর্জন করে ওঠে একযোগে। এই ভণ্ডামির হাত থেকে দূরে, বহুদূরে···

—কে ?

সুলতা।

—দাদা, আমার এই কানের ছুলজোড়া নিয়ে যাও। সুলতা বললে।

—সুলতা! বিস্ময়-কণ্ঠ তিমিরের।

—হ্যাঁ দাদা। আমি মোটেই দুঃখ পাব না। বাবার ওষুধ নিয়ে এস।

—কিন্তু তোর কানে যে আর কিছু রইল না রে ?

সুলতা হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল।—তোমাদের সংসারে আমিও যে একটা মানুষ রয়েছি, এ-কথা ভুলে যাও কেন দাদা! বাবার প্রাণের চেয়ে আমার কানের দামই কি বড় হবে দাদা।

কানের ছুলজোড়া নিয়ে আবার উঠে পড়ল তিমির।

কোথায় পালাবে সে ?

এই দুঃখ-আনন্দ হাসি-অশ্রুর বিচিত্র রামধনু-সংসারকে ছেড়ে কোথায় পালাবে! এ কী দুর্নিবার রোমাঞ্চ, গাঢ় আকর্ষণ।

হঠাৎ বাইরে সদর রাস্তার দিকে একটা হইচই।

গোলমালটা তাদের বাড়ির দোর গোড়ায় এসেই থমকে দাঁড়াল। তিমির ছুটে গেল। দশ-বারোজন লোকের ভিড়ের মধ্যে তপন। জামা প্যান্ট ছেঁড়া, ধূলিমলিন, চুল উষ্কখুস্ক, সারা দেহে কঠোর অত্যাচারের স্বাক্ষর।

—কি হয়েছে ? বিমূঢ় গলায় জিগ্যেস করল তিমির।

তপনের হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে থেকে মোটা লোকটি এগিয়ে এল।—দেখুন চিনতে পারেন নাকি ছোঁড়াটাকে। আপনাদের বাড়িরই নিশ্চয়।

—কি হয়েছে ? আবার জিগ্যেস করল তিমির।

—আর হবে কি মশায়। চুরি করছিল···নবীনবাবুর দোকানে জুতো চুরি করে পালাচ্ছিল।

অপমানে লজ্জায় লাল হয়ে উঠল তিমির। নিজেকে সংযত করে বললে, চুরি করেছে এখানে নিয়ে এসেছেন কেন? থানায় জমা দিতে পারেননি?

—ভদ্রলোকের ছেলে, নেহাত ছেলেমানুষ। তাই বাড়িতেই ধরে নিয়ে এসেছি। যাও খোকা, বাড়ি যাও—

তপন ধীর পায়ে বাড়ি গিয়ে ঢুকল।

লোকগুলি আরো কিছুক্ষণ উপদেশ দিয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ল।

রাগে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ির ভেতরে এল তিমির।

—তপন…

সুলতা বললে, ও খেতে বসেছে দাদা।

খাওয়ার থালা থেকে হিঁচড়ে টেনে তুলল তিমির। তপন একটুও ভয় পায়নি, চোখে এক বিন্দুও জল নেই তার। শুধু ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইল দাদার সামনে।

হাতে-ধরা বেতটা সাপের জিভের মতো লকলক করে উঠল। তিমির চেঁচিয়ে উঠে বললে, জুতো চুরি করছিলি তুই?

তপন বললে, না—

—ওরা মিছে কথা বলেছে?

—আমি ধার চেয়েছিলাম। দিল না তাই…

তিমির গোঁ গোঁ করে উঠল।—তাই' চুরি করছিলি? বল্ হতভাগা চুপ করে আছিস কেন, জবাব দে।

তপন বললে, দুমাস ধরে আমার জুতো ছিঁড়ে গেছে। খালি পায়ে গরম ফুটপাথ দিয়ে আমি হাঁটতে পারি না…

তিমির বললে, তাই বলে চুরি করবি! স্টুপিড রাসকেল…

তপন বললে, তোমাকে তো বলেছিলাম আগেই। আমার জুতো চাই।

—জুতো দিচ্ছি—পাজী বদমায়েস—

সপাং সপাং। বেত চলল।

—দাদা, দাদা। সুলতা কেঁদে ফেলল।—এ কি, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও ওকে। দাদা, তোমার পায়ে পড়ি, ও যে মরে যাবে···

দরদর করে ঘামতে লাগল তিমির। হাত থেকে বেতটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

তপন তখনো ঠায় দাঁড়িয়ে। তেমনি ঘাড় হেঁট করে, এঁটো হাতে, জীর্ণ শীর্ণ, অত্যাচারিত।

তিমির বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। মাথার ভেতরে দাউদাউ করে আগুন জ্বলছে। আর একটা চাপা বোবা কান্না। ঝাপসা-হয়ে-আসা চোখের পর্দায় ভাসছে তপনের মুখ তরুণের মুখের আদল নিয়ে। তরুণ বিষ খেয়ে মরেছে। তপন···তপনও যদি সেই ভয়ংকর কাজ করে ফেলে। তপনকে মেরেছে সে, কারণ সে চুরি করতে গিয়েছিল। তার এক জোড়া জুতোর বড় দরকার ছিল। দাদার কাছে ধরনা দিয়ে মেলেনি। দোকানেও তাকে ধার দেয়নি। অথচ তার জুতোর প্রয়োজন জরুরী। তাই সে চুরি করেছে। চুরির শাস্তি তাকে পেতে হবে। মার খেতেই হবে ওকে। তিমিব এমন কিছু অন্যায় করেনি।

কিন্তু, সত্যিই কি তপন অন্যায় করেছে? পৃথিবীর কাছে সে একজোড়া জুতো চেয়েছিল। তার পায়ের জ্বালাকে ঢাকবার জন্যে। কিন্তু সে কেন বুঝল না, তারা গরিব। জুতো পরার চেয়ে জুতো খাওয়াই তাদের জীবনের সত্য।

হনহন করে এগিয়ে চলে তিমির।

তপন তখনো রোদে-জ্বলা আকাশের তলায় ঘাড় গুঁজে দাঁড়িয়ে। তেল কলের শ্রমিকের মতো ঘর্মাক্ত শরীর। খালি গা। পিঠের ওপর সাপের চামড়ার মতো চাকা চাকা বেতের দাগ। এক ফোঁটা জল নেই তার চোখে। যেন খরগ্রীষ্মের আকাশ। নিশ্চল নিস্পন্দ পাথরের পিণ্ড।

—আয় খেয়ে নে তপু—। সুলতা ডাকল।

তপন মুখ বুজে আবার ভাতের থালায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল। গোগ্রাসে গিলে চলল ক্ষুদে রাক্ষসের বুভুক্ষা নিয়ে। তারপর উঠে গিয়ে মুখ ধুল। ঘরে ঢুকে আলনা থেকে তার জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নিল। পুঁটলি করে বগলে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।

সুলতা নীরবে লক্ষ্য করছিল ভাইয়ের কাণ্ডকারখানা। এবার ভয় পেয়ে তার পথ আটকে দাঁড়াল।

—কোথায় যাচ্ছিস রে? চোদ্দ বছরের এক কৌটা ছেলের কাণ্ড দেখে অবাক সুলতা।—ও মা, দেখ তপু কোথায় চলে যাচ্ছে—

—ভয় নেই—তপন কঠিন গলায় উত্তর করল, আমি ছোড়দার মতো বিষ খাব না।

- কোথায় যাচ্ছিস তুই? সুলতার চোখে ত্রাস।

—বাধা দিসনে দিদি। আমাকে যেতেই হবে....আমি দেখতে চাই আমার চেয়ে একজোড়া জুতোর দাম কত বেশি। বলতে পারিস দিদি এই পৃথিবীতে আমাদের জন্মাবার মানে কি? ধকধক করে জ্বলে উঠল তপনের বিদ্রোহী চোখ। এ-চোখের ভাষা চিনতে পারে না সুলতা। অন্তরে শিউরে ওঠে।

তপন বলে চলল, বলতে পারিস, কেন আমরা জন্মালাম, কেন আমার পায়ে একজোড়া জুতো নেই, কেন তোর পরনে ছেঁড়া কাপড়, কেন কেন কেন? আমি একবার নিজের চোখে দেখতে চাই পৃথিবীকে। আমি জানতে চাই, বুঝতে চাই ধাঁধাটাকে!

সুলতা আর্তনাদ করে উঠল।—তপু কি পাগলের মতো বকছিস? কে তোকে এসব কথা ভাবতে বলেছে। কে শেখাচ্ছে তোকে এসব মাথামুণ্ডু।

তপন বললে, ভাবব না বললেই কি ভাবনা বন্ধ হয়ে যায়, দিদি। আমার বন্ধু সুনীল বইয়ের দোকানে বয়ের চাকরি নিয়েছে, আচার্যদের সন্তু চায়ের দোকানে কাজ করে, আর পাঁচু ঠোঙা বানায়। কেন বলতে

পারিস দিদি? কে তাদের ভাবতে বলেছে, কে শেখাচ্ছে তাদের এসব?

সুলতা কেঁদে ফেলল।—আমার কথা শোন তপু। এইভাবে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাস নে। বাবার অসুখ। তাছাড়া আমি তোর দিদি—তোরা একে একে চলে গেলে আমি কি করে বাঁচব! লক্ষ্মী ভাইটি আমার, কথা শোন—

তপন বললে, আমাকে যেতে দে দিদি। তোকে আমি নতুন শাড়ি কিনে দেব। চক্রবর্তীদের চায়ের দোকানে আমি কাজ যোগাড় করেছি। খাওয়া থাকা। মাইনে দেবে পঁচিশ টাকা····

—ছি ছি তপু, তোকে ও-কাজ করতে হবে না। আমার শাড়ি চাই না। লেখাপড়া করবি, বড় হবি। তখন শাড়ি কিনে দিস, নেব।

তপন আর বাধা ঠেলতে পারল না। পুঁটলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ঘরে ফিরে এসে গুম হয়ে বসল।

আপিসে বসে কাজ করতে পারে না। গাঢ় বিষণ্ণতায় মনটা দুমড়ে ভেঙে গেছে। এত টাকা দরকার যার পরিমাণ করা যায় না। প্রতি মাসেই মাইনের টাকাগুলি কর্পূরের মতো উবে যায়। আর মাসের সাত তারিখ থেকেই চলে ধারের বন্যা, ইচ্ছার বিরুদ্ধেও তিমিরকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বিনয়ের কথাই ঠিক: অঙ্ক করে বাঁচা যায়না। এক দিনের কষা অঙ্কের সঙ্গে পরের দিনের অঙ্কের মিল হয় না কিছুতেই। দুটো ট্যুশনির মধ্যে একটি গেছে। ছাত্রটি ফেল করেছে। অপরাধ শিক্ষকের যে তাকে দস্তুরমতো পড়িয়েও পাস করাতে পারল না। এক মাসের পাওনা টাকাটা নিতে গিয়ে শুধু হাতেই ফিরে এসেছে। অভিভাবক বললেন, ছেলে পাস করতে পারল না আবার টাকা কী। অত দুঃখের মধ্যেও প্রাণপণে হাসি

চাপতে-চাপতে ফিরে এসেছিল তিমির। পার্কে ঘাসের বুকে পা ছড়িয়ে ঝকঝকে আকাশের দিকে দৃষ্টি রেখে নিজেকে মনে হচ্ছিল লঘু নাটকের এক কৌতুক-নায়ক। যার সৃষ্টি হয়েছে কেবলমাত্র দর্শককে প্রচণ্ড হাসাবার জন্যে।

টেবিলের ওপর কাজের স্তূপ জমে উঠেছিল পাহাড় প্রমাণ। মন লাগছিল না কাজে। কি হবে কাজ করে? রোজই তো করছি, আজ না হয় কলম-বিরতি পালন করা গেল।

মার সংকীর্ণ গ্রামীণ মুখের নথ-নাড়া ছবিটা ভেসে উঠছে ভাবনার বন্যার ফাঁকে-ফাঁকে। লিখতে পারলে তার সংসার নিয়ে বই লিখত সে। আঁকত মার, ছবি, বাবার, সুলতা তরুণ-তপন কাউকেই বাদ দিত না। কিন্তু, লিখতে শুরু করলে নিজেকে এমন ছেলেমানুষ মনে হয় যে কলম এগয় না। তার ক্লাসিক-পড়া উঁচুপর্দায় বাঁধা মন তার হাত চেপে ধরে। লেখার চেয়ে পড়ার জগতের আনন্দলোক আর বিস্ময় তাকে রোমাঞ্চিত করে তোলে।

এই পৃথিবীর হাটে কত মানুষকে দেখেছে—নিজের চিন্তা দিয়ে তাদের লীলায়িত করেনি। ওরা এসেছে নিজেদের প্রয়োজনে, কথা বলেছে, হেসেছে খেলেছে ভালোবেসেছে, ঘৃণা করেছে—আবার বিদায় নিয়েছে। একযোগে তাদের অনেকের ছবি ঝলসে উঠছে ইস্পাতের মতো। বেঁচে থাকার এই একমাত্র আনন্দ, তীব্র আকর্ষণ। যাবার দিনেও পৃথিবী থেকে এই আনন্দই নিকিয়ে নেবে মন। বলব : যা দেখেছি যা শুনেছি যাদের পেয়েছি, যাদের হারিয়েছি তারা সকলেই বেঁচে আছে আমার মধ্যে। পৃথিবীর একটি যুগে এক অধ্যায়ে আমরা বেঁচেছিলাম—এইটুকুই থাকবে স্মরণীয় হয়ে আমাদের মনের মণিকোঠায়।

টেবিলে মাথা রেখে কতক্ষণ পড়ে ছিল তিমির, কে জানে।

পেছনে কে পিঠে হাত রাখল।

বিনয়।

ম্লান হাসল তিমির। হাসি, না কান্নার ছদ্মবেশ।

—কি হয়েছে? শরীর খারাপ?

তিমির হেসে বললে, All's right with the world! আপনি ব্রাউনিঙ পড়েছেন বিনয়বাবু?

বিনয় বললে, আমি নেহাতই গদ্য-চর জীব। দিস্ ওয়ার্লড ইজ টু মাচ উইথ আস।

তিমিরের মস্তিষ্ক যেন কবিতায় কথা কয়ে উঠতে চায়।

—শুনবেন কবিতাটা?

—বলুন।

তিমির আবৃত্তি করতে শুরু করল:

I was ever a fighter, so—one fight more,
The best and the last!
I would hate that death bandaged my eyes and forbore,
And bade me creep past,
No! let me taste the whole of it, fare like me peers
The heroes of old,
Bear the brunt, in a minute pay glad Life arrears
of pain, darkness and cold.

বিনয় জিগ্যেস করল, বাবা কেমন আছেন?

তিমির বললে, জ্বর ছেড়েছে। ওষুধ এখনো চালিয়ে যেতে হবে।

বিনয় বললে, কই আমাদের ওখানে তো আর গেলেন না। কমলা কত খুশি হয় আপনাকে দেখলে।

তিমির ক্লান্ত উদাস সুরে বললে, যাব। নিশ্চয়ই যাব। টাকার

ধান্ধায় এমন ভাবে ঘুরতে হচ্ছে, সময় পাচ্ছিনা মোটেই। বুঝলেন বিনয়বাবু, টাকা একটা ব্যাধি। সুস্থ লোককে ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলবার পক্ষে টাকাই যথেষ্ট।

বিনয় হেসে বললে, টাকা তো চাই। চাই নে?

তিমির বললে, চাই। কিন্তু সমস্ত চিন্তাগুলো যদি টাকা হয়ে রূপ নেয় তাহলে মানুষ হাঁপ ছেড়ে বাঁচবে কখন। কি রকম বদলে যাচ্ছি জানেন বিনয়বাবু, বেঁচে থাকার কামানের চাকায় তেল দিতে দিতে ফতুর বনে গেলাম। আজ ক-মাস থেকে কোনো বই ছুঁতে পারি না, আমার জীবনের একমাত্র দামি আভিজাত্য। চার দেয়াল থেকে টাকার কায়াহীন আত্মা মরিয়া চিৎকার জোড়ে। বইএর নিরাপদ দুর্গে আশ্রয় নিতে নিজেরই কেমন লজ্জা করে।

বিনয় বললে, দারিদ্র্য তো এখানেই। আর এই অভিশাপের বিরুদ্ধেই তো আমাদের ধর্মযুদ্ধ। বুঝলেন ভাই, অনেক পুড়তে হবে, অনেক ঝুড়তে হবে, জীবন-সমুদ্র মন্থনে হলাহল পান করেও নীলকণ্ঠের সাধনা আমাদের। শুনেছেন—হাসবেন না, আমি আবার গান শিখছি। ঝোঁকটা আমার বরাবরই ছিল, থেমে-পড়া ভাবটাকে পেছন থেকে ধাক্কা মারল কমলা। চলাতে শুধু গতি পেলাম না, পেলাম আবেগ···

সহকর্মীর দিকে অবাক শ্রদ্ধা-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল তিমির। বিনয় যেন এই ভাঙাচোরা জীবনদুর্গের উপর তার জয়ের কেতন উড়িয়ে দিতে চায়। ঔদ্ধত্য নয়, জীবনের সমীকরণ। আশা আর আশ্বাস, বিশ্বাস আর প্রজ্ঞা।

কিন্তু কে বদলাল তার জীবনের ধারা? কমলা! শারীরবিদরা বলেন খাদ্যের অব্যক্ত শক্তিই দেহের কোষে কোষে অণুতে অণুতে মিশে গিয়ে তাপ, বিদ্যুত, উৎসাহের ফুর্তিতে ব্যক্ত হয়ে ওঠে। একটি মেয়ের হৃদয়ের মধ্যে এত উত্তেজনা, জীবন এষণা। নারীর প্রেম। ও যেন নদীর মতো—এক হাতে তার ধ্বংসের ডম্বরু, অন্য হাতে সৃষ্টির

নাচন। মনীষা আর কমলা—নারীর দুই প্রকৃতি, ঋতুর দুই লীলা। কমলা কবি বিনয়কে জয় করে নিয়েছে, জয় করে ফিরিয়ে দিয়েছে তাকে। 'আমি কিছু দিতে চাই নহিলে জীবনে জীবনে মিল হবে কি করিয়া।'

—আচ্ছা তিমিরবাবু—বিনয় হঠাৎ জিগ্যেস করল, কিছু মনে করবেন না···আপনাকে দেখে মনে হয় কোথায় যেন আপনি একটা বড় রকমের ঘা খেয়েছেন···

তিমিব হাসল।—এই কথাটা কি এত চিন্তা করে বলতে হয়। জানেন না আমাদের সংসারের অবস্থা।

বিনয় বললে, আপনি এড়াতে চাচ্ছেন। আপনি বেশ বুঝতে পারছেন, আমি কি বলতে চাচ্ছি।

তিমির বললে, আমি যে-উত্তরই দিই তাই তো আপনার মনে হবে যে এড়িয়ে যাচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যদি বলি : রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

বিনয় হাসল।—তারও উত্তর তো রবীন্দ্রনাথের ভাঁড়ার থেকেই দেয়া যায় তিমিরবাবু। রাতের সব তারাই আছে দিনের আলোর গভীরে।

তিমির একটু চুপ থেকে চিন্তিত গলায় বললে, আমার দুঃখের কারাগার আমার নিজেরই সৃষ্টি বিনয়বাবু। আমার জীবনটা বাঁধা ছিল শুভংকরীর আর্যায়। হিসাবের বাইরের জীবন সম্পর্কে আমার বিশ্বাস ছিল না, শ্রদ্ধা তো দূরের কথা। রাখালরাজা আজ রাজকন্যের মিলন কাহিনী আমার শিশু মনকে উদ্বুদ্ধ করত বটে, কিন্তু প্রবীণ জহুরী মনটা থাকত তার থেকে সাত হাত দূরে। আমাদের ভালো-বাসাটা ঠিক এমনিই ছিল—বেসুরো, ছন্দপতন।

—তারপর ?

—তারপরটাই তো ভাবছি বিনয় বাবু। ভাবছি আর ভাবছি। আজ আমার মুঠোয় ভাবনার কতগুলো পোড়া ছাই আর কিছু নেই।

বিনয় চুপ করে রইল।

—আসল ব্যাপারটা কি জানেন বিনয়বাবু, ভাবনা দিয়েও অঙ্কটা কিছুতেই মেলাতে পারছিনে। অঙ্কটা মেলাবার জন্যে যে সামান্যতম প্রত্যয় থাকা দরকার তাই আমার নেই।···

একটু হেসে তিমির বললে, কেমন সব গোলমাল ঠেকছে, না? অনেকটা কুকুরের ল্যাজ সোজা করার মতো····

টিফিনের সময় একা বেরিয়ে পড়ল আপিস থেকে।

ইতস্তত অন্যমনস্ক ঘুরে বেড়াল। চায়ের দোকানে বসল। খবরকাগজ ওলটাল কিছুক্ষণ। সময় যেন কিছুতেই কাটতে চায় না। ছেঁড়া ছেঁড়া আলোচনা। টুকরো টুকরো কথা। মানুষের মুখ। ঘর্মাক্ত, কালো—কালসিটে, ফ্যাকাশে রুগ্‌ণ। কান্না আর আর্তি। কমলা—বিনয়। সুষমা-ললিতা-জগদীশ। মনীষা। কত মুখ, মুখের মিছিল। তারপর উঠল তিমির।

ব্যোমকেশ বললে, আয়। তোর যে দর্শন পাওয়াই ভার।

তিমির হাসল। বনেদী অভিনেতার মতো কেবল হাসি দিয়ে তার মানসলোককে পরিস্ফুট করতে চাইল।

ব্যোমকেশ ক্ষুব্ধস্বরে অভিযোগ করল, চাকরি পেয়েও তোর মুখের ভাব কিছুতেই বদলাল না। এইভাবে মুখটা অহেতুক সিরিয়াস রাখবার মানে কি? মুখটাকে প্যাঁচার মতো করে না রাখলে বোধ হয় নিজেকে দার্শনিক বলে প্রচার করা যায় না।

তিমির উত্তরে আবার হাসল।

—হাসছিস যে?

—কি বলব। তুই তো সব বলছিস। মন ভালো নেই ভাই; বাড়িতে বেজায় বিশ্রী অবস্থা চলেছে।

—বাবা কেমন আছেন? নরম গলায় জিগ্যেস করল ব্যোমকেশ।

—একটু ভালো।

* * *

—কেরানীবাবু···ও কেরানীবাবু···

ফিরল তিমির।

তাদের আপিসের পিওন বনমালী।

—কি রে?

—শীগ্‌গির···সাহেব আপনাকে ডাকছেন···

—আমাকে? বিস্মিত তিমির।

—হ্যাঁ। আপনি বেরিয়ে আসা মাত্রই খোঁজ করেছিলেন। বড়বাবু আমাকে ডাকতে পাঠালেন। চলুন—শীগ্‌গির—

—তুমি যাও। আমি আসছি।

চিন্তাটা যেন আরো ঘোলাটে হয়ে উঠল। চেয়ারম্যানেব সঙ্গে ইণ্টারভিয়ুর সময় যে-দেখা, তারপর কোনোদিন কোনো প্রয়োজনে তাঁর চেম্বারে পা দিতে হয়নি।

চিন্তিত মুখে সুইং ডোব ঠেলে ভেতবে ঢুকল তিমির।

—নমস্কার স্যার···

আলগোছে তার দিকে এক পলক চেয়ে নিয়ে শিবপ্রসাদ বড়বাবুর সঙ্গে কি-এক গুরুতর কাজে ডুবে গেলেন।

তিমির দাঁড়িয়ে রইল।

মাথার সামনে দেয়াল ঘড়িটা টকটক করে চলেছে। তাব নিচে জাতির জনক গান্ধিজীর ফোটো, সৌম্য প্রশান্ত। চেয়ারম্যানের টেবিলে ফাইলেব স্তূপ। ব্লটিং পেপারের প্যাডের এক পাশে প্রাইভেট রিজার্ভের টিন। ছাইদানিতে জ্বলন্ত সিগারেট, ধোঁয়া উড়ছে চক্রাকারে। মাথায় পাতলা পাক-ধরা কোঁকড়ানো চুল, ভ্রূর দু-একটা চুলেও পাক ধরেছে, চওড়া কাঁধ, শক্ত কবজি, লিখতে লিখতে চোয়ালের হাড় দুটো মাঝে মাঝে ঠেলে উঠছে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘামতে লাগল তিমির। চেয়ারটা টেনে বসবে কি, না পরেই আসবে একবার। বড়বাবুর মাথার টাকটা চকচকে দেখাচ্ছে, ঘাড় ছেঁটেছেন শৌখিন করে। সিল্কের পাঞ্জাবিটা ঘাড়ের

কাছে তেল-মলিন। মাথার ওপরে ঘড়ির টকটক শব্দ, মহাত্মা গান্ধির প্রতিকৃতি, টেবিলে ফাইল, ফাইলের স্তূপ, প্রাইভেট রিজার্ভের টিন।

সিগারেট ধরালেন শিবপ্রসাদ।

বড়বাবু ফাইলের ফিতে বাঁধলেন, দাঁড়ালেন, আবার কিছু আলোচনা, হাসলেন বড়বাবু, ঘাড় নাড়লেন, নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে গেলেন।

কয়েকটা উদ্বেগজনক মুহূর্ত।

—আমায় ডেকেছিলেন?

—বস।

চেয়ার টেনে বসল তিমির।

টেবিলে-রাখা ফাইলটার নোটশীট পড়ছিলেন শিবপ্রসাদ, ঠোঁটে চেপে-ধরা সিগারেট, ধোঁয়ায় চোখদুটো পিটপিট করছে, ডান হাতের আঙুলে মোটা সোনায়-বাঁধানো নীলাটা জ্বলজ্বল করছে।

বসে বসে ঘামতে লাগল তিমির, গলার ভেতরটা খসখসে ঠেকছিল, কাশির ধমকটাকে থামিয়ে রেখে একটু নড়ে চড়ে বসল।

ঘড়িটা তেমনি সশব্দে কুচকাওয়াজ করে চলেছে।

আর সম্পূর্ণ নিঃশব্দতা।

—এই নোটটা তোমার? ফাইলের নোটশীটটায় আঙুল রেখে জিগ্যেস করলেন শিবপ্রসাদ।

—হ্যাঁ স্যার—

—ইংরেজি তুমি ভালোই লেখ, হাতের লেখাও বেশ ঝরঝরে... আর একটা সিগারেট ধরালেন শিবপ্রসাদ।

তিমির মৌন।

—ল-টা পড়লে না কেন?

তিমির তবু চুপ।

—বাড়িতে কে কে আছেন? ভাইবোন কটি? বোনের বিয়ে হয়েছে। পড়ছে?

তিমির শু—একটা কথার উত্তর দিচ্ছিল।

শিবপ্রসাদকে চিন্তামগ্ন দেখা গেল।

—কেমন লাগছে কাজকর্ম? এখানে অবশ্য কোনো প্রসপেক্ট নেই। কালেক্ট্রিতে চেষ্টা কর না কেন?

শিবপ্রসাদ কলিংবেল টিপলেন।

বেয়ারার হাতে ফাইলটা দিয়ে বললেন, বড়বাবুকে দাও—

বেয়ারা চলে গেল।

চেয়ার ছেড়ে উঠলেন শিবপ্রসাদ। একবার জানলার কাছে দাঁড়ালেন। কাঁচের গায়ে বিকেলের পাণ্ডুর রোদ চিকচিক করছে। সেই আলোতে উজ্জ্বল দেখাল চেয়ারম্যানের মুখ। তারপর ফিরলেন, এগিয়ে এলেন টেবিলের সামনে, জলের গ্লাসের ঢাকনিটা তুলে জল খেলেন।

—তোমার আর কোনো কাজ আছে?

—আজ্ঞে না।

—তাহলে আমার বাড়ি হয়ে ঘুরে আসবে? আমি বেয়ারাকে নিয়ে এখুনি ট্যুরে বেরচ্ছি। খবরটাও দেয়া হবে, আর এই প্যাকেটটা আমার মেয়ে মনীষাকে দিয়ে আসবে···

—আমি।

—কেন? অসুবিধা হবে?

—না। দিন প্যাকেটটা।

—থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ইয়ংম্যান।

বেরিয়ে আসছিল তিমির, শিবপ্রসাদ ডাকলেন, শোন—

—স্যার?

—মনীর সঙ্গে তোমার কতদিনের আলাপ?

—আজ্ঞে—?

—মানে জিগ্যেস করছিলাম, মনী তোমার কথা শুনলে খুশি হয়। আচ্ছা—এস।

টেবিলে ফিরে এসে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল তিমির। সারা মস্তিষ্ক শূন্য ধোঁয়াটে ঠেকছে। আর দেহজোড়া ক্লান্তির বন্যা। তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটা অদৃশ্য শক্তি যেন তাকে কোন্ এক অজানা রহস্যে টেনে নিয়ে চলেছে। ঘোরঘোর আচ্ছন্নতা। চেতন-অচেতন আলো-আঁধারের দ্বৈত-সত্তা। এত আলো, আর এত অন্ধকার, দুইয়েরই কোনো অর্থ বোধগম্য হচ্ছে না তার কাছে। মনীষা, কি চায় তার কাছে, কেন এত আলো এত অন্ধকারে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে সে।

ঘড়িতে পাঁচটা বাজল। এক-এক করে আপিস খালি হতে লাগল।

বিনয় এসে জিগ্যেস করল, বাড়ি যাবেন না?

—চলুন।

বিকেলের ঝিরঝিরে হাওয়ায় মনের গুমট কাটবার প্রেরণা পায়।

· বিনয় তাদের দুপুরের আলোচনাটা মনে রেখেছে। সিগারেট ধরিয়ে চলতে-চলতে বললে, একটা কথা কি জানেন তিমিরবাবু, পৃথিবীতে যে-জিনিসের জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। অমর হবার ভান নিয়ে আমরা কেউই জন্মাইনি।

তিমির প্যাকেটটা হাত বদলে হেসে বললে, শুনতে ভালো লাগছে। যদিও পুরনো কথা।

—কথা পুরনো হলে ক্ষতি কি, যদি সত্য থাকে। যা বলছিলাম, জীবনকে জানতে হয় জীবন দিয়ে—প্রেমের ভিত্তিও সেখানে। আমরা সত্য জীবনের স্বরূপ চিনি না, বুঝি না, আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে এক নতুন সত্যকে তৈরি করি আর সেই সত্যের জারক রসে ভিজিয়ে নিই আমাদের দৃষ্টি।

—আপনি কি বলতে চাচ্ছেন?

—বলতে চাচ্ছি এই কথাই যে-বস্তুটির পেছনে আপনার নিজেরই

প্রত্যয় নেই সেখানে অপরের প্রত্যয়কে কি করে আশা করবেন। আবেগ দিয়ে সব কিছু বিচার করা মানুষের রোগ, কিন্তু যুক্তির শক্ত কঠিন ডাঙ্গা না থাকলে সে-আবেগ আপনাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। যেমন আপনাকে নিয়ে গেছে। কিন্তু, আর বকব না। আমার আবার একটু বাজারে যেতে হবে। চলি।

বিনয় চলে গেল।

চৌমাথার মোড়ে এসে আবার উলটো দিকে হাঁটতে শুরু করল তিমির।

দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধির মতো চিন্তাটা কিছুতেই দূর হচ্ছে না। হঠাৎ এই প্যাকেটটা তার হাত দিয়ে পাঠানোর বন্দোবস্ত করলেন কেন চেয়ারম্যান সাহেব। তার ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে ওঁর এত কৌতূহলের উৎসই বা কোথায়। মনীষা কি বলেছে তার কথা, কতদূর বলেছে। আর কি ভেবেছেন শিবপ্রসাদ, হেসেছেন, কৌতুক বোধ করেছেন। বিলিআর্ডের বলের মতোই লাঠির গুঁতোয় তাকে নিয়ে খেলবার ইচ্ছা। কি আছে প্যাকেটে?

কি হয় যদি ফিরে যায় এখান থেকে। কিংবা গেটে দরোয়ানকে দিয়েও তো পৌঁছে দিতে পারে প্যাকেটটা।

সন্ধ্যে নামছে, সারা দিনের তপ্ত প্রদাহের পর সান্ধ্যবাতাসে কাঁপছে বায়ু তরঙ্গ। সারকিট হাউসের রেডিয়োতে বাজছে 'আমার গোধূলি লগন এল বুঝি কাছে রে।' রিক্‌শার ঘণ্টার আওয়াজ, টুং টুং টুং টুং। একরাশ ধুলো উড়িয়ে একটা ট্যাক্সি উড়ে গেল সোজা উত্তরের দিকে। রাজপথ। মানুষ, মানুষের মুখ। মিছিল।

গেট পেরিয়ে ভেতরে লনে পা বাড়াল তিমির। হাসনুহানা আর নাম-না-জানা ফুলের গন্ধে সন্ধ্যা ভারি। আধো অন্ধকারকে কোলে নিয়ে নির্জন সন্ধ্যা যেন ধ্যানে মগ্না।

—কাকে চাই?

—দিদিমনি···

—উনি তো নিচে নামতে পারবেন না। কারুর সঙ্গে দেখা করবেন না।

—কেন ?

—দিদিমনির অসুখ করেছে।

—অসুখ!

তিমির ফিরবার জন্যে পা বাড়িয়েছিল হঠাৎ প্যাকেটটার কথা মনে পড়ে গেল।—এই যে শোন—এইটে দিদিমনিকে দিয়ে দিও।

দরোয়ান প্যাকেট নিয়ে বিদায় হতে তিমিরও ফিরবে-ফিরবে করছিল, কিন্তু মস্তিষ্কের মধ্যে একজোড়া পোকা যেন ব্যাজব্যাজ শুরু করেছে। অসুখ! কি অসুখ করল মনীষার। সেদিনকার আদিনার সেই সন্ধ্যার জ্বরেরই জের নাকি! সত্যি কি খুব বাড়াবাড়ি অসুখ। নাচ বন্ধ হয়েছে, বোস সাহেবরা আসা বন্ধ করেছেন! এই সন্ধ্যায়, বাড়ি ভরতি এই নির্জন সন্ধ্যায় রোগশয্যায় শুয়ে শুয়ে কি ভাবছে মনীষা! হাসনুহানার গন্ধ, নাকি রজনীগন্ধার! চোখ দুটো কি বোজা, আর গোধূলি শেষ ক্লান্তি জড়িয়ে ধরেছে তার সুকুমার দেহ সৌষ্ঠবকে! তারপর রজনীগন্ধা যখন ঘুমবে, হাসনুহানারাও যখন হাই তুলবে, তখন—তখন কি করবে মনীষা! মন নিয়ে লুকোচুরি খেলবে, পানকৌড়ির মতো ডুব দেবে শেওলার গভীরে। নাকি, নাচের মুদ্রায় জীবনকে আভাসিত করবে। মনীষা, মনীষার অসুখ করেছে, মানুষ, মানুষের মুখ, জোনাকির দ্যুতি, হাওয়ার মর্মর···

—বাবুজি···

—কে ? এ্যাঁ—হ্যাঁ এই যাচ্ছি, চলে যাচ্ছি···

—আসুন। দিদিমনি আপনাকে ওপরে ডাকছেন।

আমাকে। কেন ? মনীষার অসুখ করেছে, কি ভাবছে সে, রজনীগন্ধা, ডাক্তার, জোনাকির দ্যুতি, না।

—বাবুজি···

—হ্যাঁ। চল।

আর কতদূর নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি। হেসে উঠল তিমির।

—কিছু বলছেন বাবুজি?

—না। চল।

সমুদ্রনীল ভারি পর্দাটা টেনে ধরল দরোয়ান। নীল নীল নীল। সমুদ্র-বিস্ময়। ঘরে ঢুকে চোখ নীলের বন্যায় অন্ধকার হয়ে এল তিমিরের। মনীষা কোথায়। অপরিসীম নীলের মধ্যে একাকার হয়ে হারিয়ে গেছে বুঝি।

—এস। বিছানার আড়াল থেকে মনীষা ডাকল।—বস এই চৌকিতে। প্যাকেটটা দিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলে কেন?

তিমির স্থির হয়ে বসল চৌকিতে।

মনীষা, মনীষার চোখ, হাসি, ক্লান্ত, উদাস। নীল চাদরে জড়ানো ওর দেহ। বালিশটা পিঠের দিকে কাত-করা। মাথার বিস্রস্ত চুল পুঞ্জীভূত অন্ধকারের মতো বুকের এক পাশে ছড়ানো।

—তোমাকে দেখতে পাচ্ছি নে···। তিমির মৃদু গলায় জানাল।

—আলো জ্বাললেই কি আমাকে দেখতে পাবে তিমির!

—কি হয়েছে তোমার মনীষা?

—দেখতেই তো পাচ্ছ বিছানা নিয়েছি। অসুখ করেছে।

—অসুখ! কি অসুখ তোমার?

—সে-শুনে তোমার কাজ নেই। বাবাকে আপিসে যাবার সময় বলেছিলাম তোমার আসার জন্যে। বলেছেন তাহলে। আজ কদিন থেকে এমন বিশ্রী আর একা-একা ঠেকছে···রাগ করনি তো?

—কেন?

—তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছি বলে!

—না।

মনীষা নিশ্বাস ফেলল। হাসল।—বাবা আমার জন্মদিনের তারিখটি ভোলেননি দেখছি। এই প্যাকেটটা তোমার হাত দিয়ে পাঠিয়েছেন। আমার জন্মদিনে তুমি কি এনেছ তিমির ?

তিমির চুপ।

—আনানি ? ভুলে গেছ। বেশ করেছ। জন্মদিন আর মৃত্যুদিন সব সমান আমার কাছে। সেবার আমার জন্মদিনে কি দিয়েছিলে তুমি, মনে আছে ?

তিমির মাথা নাড়ল।—আছে।

—নেই। আমাকে দিয়েছিলে শেলীর 'লভ্‌স ফিলজফি' উপহার। আমি আজো ভুলিনি সেই লাইনগুলি। 'Nothing in the world is single, all things by a law divine…'

—মনীষা, চুপ কর। তোমার অসুখ।

—আমাকে বলতে দাও তিমির। 'and the sunlight clasps the earth, and the moonbeams kiss the sea—

—চুপ কর, চুপ কর মনীষা।

—তোমার ভয় করছে তিমির। ভূতের ভয়। হি হি। হেসে উঠল মনীষা।

—মনীষা, চুপ কর, চুপ কর বলছি। আমি রক্ত মাংসের মানুষ ভুলে যাও কেন ?

—রক্ত আর মাংস…। খিলখিল করে আবার হাসল মনীষা। হাসির ধমকে, না অন্য কারণে তার চোখের তারা দুটো হঠাৎ ভিজে ভিজে ঠেকল।

তিমির সজোরে ওর ডান হাতটা চেপে ধরল।—বল, কি চাও, কি চাও তুমি আমার কাছে! কেন আমাকে নিয়ে এমন করছ। বল উত্তর দাও।

—ছাড়, লাগছে।

—না। আগে জবাব দাও আমার কথার।

—দিচ্ছি…দিচ্ছি। ছাড় আগে।

তিমির হাত ছেড়ে দিল।

মনীষা হাসল।—উঃ খুব পুরুষ হয়েছ তুমি! ভুলে যাও আমি রোগা, অসুখ করেছে আমার।

তিমির আহত গলায় জিগ্যেস করল।—কি অসুখ করেছে তোমার? ডাক্তার দেখিয়েছ?

—অসুখ শুনে কি করবে। যদি বলি খুব—খুব খারাপ অসুখ করেছে। ভয়ে পালাবে তো?

—না।

—বীরপুরুষ! 'বাখানি তোর বীরপনা সৌমিত্র কেশরী!' কী ভুল বললাম নাকি গো?

তিমির চুপ।

—আচ্ছা তিমির…

—বল?

—ওফেলিয়া তো জলে ডুবে মারা গিয়েছিল, না? খুব কষ্ট হয়েছিল মেয়েটার?

—জানি না…

—মহানন্দায় কত জল আছে, কিন্তু আমার যে ডোবা হল না।

তিমির হঠাৎ রাগ করে উঠে দাঁড়াল।

—এ কী! চললে!

—হ্যাঁ। তোমার পাগলামো শোনবার সময় আমার নেই।

—দাঁড়াও। যেও না লক্ষ্মীটি।

—একী! তুমি কাঁদছ মনী, মনীষা…

—হ্যাঁ। কাঁদছি। আমার জন্মদিনে আমি কাঁদছি।

—কেঁদ না, ছিঃ কেঁদ না, কথা শোন মনী…

—না না। ছেড়ে দাও। তোমার সহানুভূতি আমি চাইনে। কেন, কেন তুমি আমাকে ভেঙে চুরমার করে দিলে না, তোমার

লোভ দিয়ে, তোমার কাপুরুষতা দিয়ে কেন আমাকে টেনে নিতে পারলে না।

—মনী মনীষা…

—ভুল আমি করেছি। কিন্তু আমাকে ভুল করতে দেখে কেন দম্ভ দেখিয়ে তুমি সরে গেলে। কেন ভুলের জঞ্জালে আমার জীবনটাকে কাঁটাবন করে তুললে।

নিঃশব্দ রাত্রির অন্ধকারে মনীষার কথাগুলো যেন থরথর করে কেঁপে উঠল। একটা আহত পাখি রক্তাক্ত ডানায় হঠাৎ ডানা ঝাপটিয়ে আকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল। গভীর নৈশব্দ্য। বাইরের নিস্তব্ধতা যেন ঘরের দুটি প্রাণীকেও মূক বিধুর করে তুলল।

মনীষার মুখের দিকে চাইতে পারছে না তিমির। ভয় করছে, হিমহিম ক্লান্তিতে সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। আর মগজের ভেতরটায় কেমন এক নিরেট শূন্যতা পাক খেয়ে-খেয়ে উঠছে। হাত বাড়ালেই হাত দিয়ে মনীষাকে স্পর্শ করা যায়, কিন্তু মন দিয়ে তো তাকে ছুঁতে পারছে না। মনীষা এক অসম্ভব প্রহেলিকা। পৃথিবীর বয়েস বেড়েছে, মানুষের মনের রঙ পাকা হয়েছে, পিছু হাতড়েও অতীতের দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনা যায় না। আজ আর কোনো আত্মপ্রত্যয় অবশিষ্ট নেই তিমিরের। মনীষার কথাগুলো যেন অবাস্তব ঠেকছে। সাজানো-গোছানো এক নাটকের চিত্ত-চমৎকার দৃশ্য। মনীষা রঙ বদলাতে পারে, পোশাকের মতোই তার মনের রঙ বদলায়, বিকেলের রঙ সন্ধ্যায় ফিকে হয়ে আসে, রাত্রে আর তার চিহ্ন থাকে না। পরিবর্তনের বিচিত্ররূপে রঙিন ওর মন, আর সেখানে শুধু তারই মনের প্রতিবিম্ব। আজ অসুস্থ বলেই ওর মনের গ্রন্থি আলগা হয়ে গেছে, সুস্থ হলে মনীষা তার নিজস্ব স্বভাবে ফিরে আসবে। নাচের মুদ্রায় তার জীবন মুকুরিত হবে, বোস-সাহেবরা আসবেন, শহরের ছোকরা অফিসাররা আসবেন, জীবনের

উত্তেজনার মশলায় নবরসে নিজেকে মাতোয়ারা করে তুলতে পারবে মনীষা।

মনীষা কি ভাবছে। তিমিরের মনের গলিঘুঁজির সন্ধান কি সে পাচ্ছে। চোখ বন্ধ করে শুয়ে আছে সে, মৃদু নিশ্বাসের শব্দ, চাদরের তলায় একজোড়া দমবন্ধ পাখি সমুদ্র-তরঙ্গে ফুলে-ফুলে নিশ্বাস নিচ্ছে।

যেন লাশকাটা ঘরে মূক-বিস্ময়ে বসে রয়েছে তিমির। টেবিলের পরে বিস্ফারিত রমনী-দেহ। রজনীগন্ধা আর বাসী শবের গন্ধ। অদূরে মেথর দাঁড়িয়ে, প্রৌঢ় ডাক্তার দুজন সহকারী নিয়ে প্রস্তুত। দেহের যবনিকা উন্মোচন কর, পিত্তের মতো কালো রক্ত, মাংস আর হাড়ের পাণ্ডুলিপি। ছোকরা ডাক্তার দুজন ঘন ঘন ঠোঁট চাটছে, বাইরে একটা কুকুর ঘেউঘেউ করছে, প্রৌঢ় ডাক্তারের চোখে বিকারহীন এষণা।

না, না, না···যন্ত্রণায় মাথার ভেতরে যেন বিস্ফোরণ শুরু হল তিমিরের, চোখ বন্ধ করে যন্ত্রণাটা এড়াবার চেষ্টা করল সে।

—কি হল, কি হল তোমার ?

—কিছু হয়নি।. আমি এবার যাচ্ছি।

—যাবে ?

—হ্যাঁ।

—এই আমাদের শেষ দেখা। পৃথিবী গোল, ঘুরতে ঘুরতে কোনো একদিন আবার হয়তো দেখা হয়ে যাবে। সেদিন চিনতে পারবে তো ?

—জানি না···

—কত রাত হয়েছে তিমির ? আজ কি তিথি ? চাঁদ কি আজ উঠবে না ?

—জানি না···

—শোন—রাগ করো না। আমার এই শরীরের অবস্থা, তোমার রাগ করা কি উচিত হচ্ছে ?

—শরীর খারাপ তো ডাক্তার দেখাও। আমার কি করার আছে। তোমার নাচের ওস্তাদ কোথায় গেল, কোথায় গেল তোমার বোস-সাহেবরা…

—তিমির। আর্তনাদ করে উঠল মনীষা। তুমি, তুমি এত নীচ, এত ছোটো জানতাম না।

—তোমাদের মতো মেয়েদের মুখে প্রেমের নাটক কম উতরয় না। জীবনে নাটক থাকতে পারে, কিন্তু জীবনটা আর যাই হক নাটকীয় নয়।

—চুপ কর, চুপ কর…

—না। চুপ করব না। ভেব না, চাকরির জন্যে সুপারিশ করে আমার হৃদয় কিনে ফেলেছ, মাথা কিনেছ ঠিকই, কিন্তু হৃদয় অত সস্তা বস্তু নয় যে যাকে-তাকে বিকিয়ে দেয়া যায়।

—আর কিছু বলবে ?

—না।

—শোন। যে-দারিদ্র্যকে নিয়ে তুমি অহংকার কর, আজ দেখছি সেই ভয়াবহ দারিদ্র্য তোমাকে একেবারে মনে প্রাণে ছোট করে দিয়েছে। ধনের অহংকার এইভাবে মানুষকে করুণার পাত্র করে তোলে না! চলে যাবাব আগে শেষ কথাটা বলে যাই, উপদেশ শোনালেও ক্ষমা করো—জীবনে সার্থক হতে হলে নিজের হৃদয়কে ধনী করো।

—ধন্যবাদ। তিমির ঝড়ের মতো বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। বারান্দা পার হয়ে সিঁড়িতে নামতে গিয়ে তাব জীবনে আজ প্রথম মনে হল, সিঁড়িটা আজ অনেক—অনেক নিচে নেমে গেছে—পাতালকে ছোঁবে বুঝি। হাসনুহানার গন্ধ, না রজনীগন্ধা, নাকি লাশকাটা ঘরে বাসী শবের সৌরভ। হঠাৎ উত্তেজনার মাথায় একি ছাইভস্ম মনীষাকে শুনিয়ে দিল সে। এ-কথা তো সে বলতে চায়নি। আবার কি ফিরে যাবে, ক্ষমা চাইবে মনীষার কাছে। না, এই মুখে আর

ফিরে যেতে পারবে না। তারচেয়ে আর একদিন না হয় ক্ষমা চেয়ে নেবে।

বাড়ি।

—কে রে জানলায় দাঁড়িয়ে?

—দাদা আমি···

—লতা—কী করছিস অন্ধকারে!

—অমনি দাঁড়িয়ে আছি। সুলতা হাসি টেনে বললে, তোমার আজ এত দেরি।

—হ্যাঁ। একটু কাজ ছিল। কিন্তু, তোর মুখ এত ভার-ভার কেন? মা বকেছে?

—না। এই তো হাসছি।

—তুই আগের চেয়ে সুন্দব হয়েছিস।

—যাঃ।

—যা নয়, সত্যি। আর সুন্দর হওযাটা কি অপরাধ! একটুখানি সুখী হবার জন্যে পৃথিবীর মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অনেক ভেবে দেখলাম, পৃথিবীটা যত খারাপ ভেবেছিলাম, তত খারাপ নয়। তুই কি বলিস?

সুলতা হেসে বললে, বারে! আমি কি জানি!

তিমির বললে, জানিসনে বলেই তো তুই বেঁচে গেছিস। সুখ পাবার চেষ্টা করলে কি আর সুখী হওয়া যায়! খেপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশ পাথরের মতো অবস্থা!

জামা ছাড়তে-ছাড়তে তিমির আবার বললে, আচ্ছা ধর্ লতা, হঠাৎ একদিন রাত্রে তোর কাছে ভগবান এসে হাজির, তুই কি বর চাইবি?

সুলতা খিলখিল করে হেসে উঠল।—আহা, এই বাড়িতে ভগবান আসবে! বসাতে দেব কোথায়?

—ধর্ না এলই। কি চাইবি তাঁর কাছে ?

—চাইব, দাদার একটা ভালো চাকরি পাইয়ে দাও।

—আমার ভালো চাকরিতে তোর কি হবে ? নিজের জন্যে কি চাইবি ?

—নিজের জন্যে আবার কি চাইব ? বলব, দাদার জন্যে একটা টুকটুকে বউ এনে দাও।

—আমার বউ যখন পায়ে ঝামা ঘষে দিতে বলবে ?

—দেব।

—আর যখন বলবে, ননদিনী আমাদের ঠাকুরজামাই এনে দাও।

—দাদা, তুমি ভীষণ অসভ্য !

সুলতার লজ্জারুণ মুখের দিকে চেয়ে হাসতে ভুলে যায় তিমির। সুলতা আর মনীষা ! সুলতার জীবনের পরিধি ছোটো, সামান্য ঘরোয়া আঙ্গিনায় ফুল ফুটিয়ে সে সুখী। আর মনীষা ! তার বৃত্ত বড়, বড় বলেই সেখানে গতি নেই, প্রবাহ নেই, আছে রঙিন ফেনা আর বুদ্‌বুদ্। তার ইচ্ছা আছে নেই ইচ্ছার জোর।

—আমার এক জানাশোনা ছেলে আছে। ভালো চাকরি করে, দেখতে-শুনতেও বেশ।

সুলতা চমকে উঠল। দাদা ঠাট্টা করছে নাকি ! কি বলতে চায় দাদা।

—তুই যদি রাজি থাকিস বলতে পারি তাকে। আমার কথা মনে হয় ফেলতে পারবে না···

নিশ্বাস রোধ হয়ে আসে সুলতার। মুখ কালি হয়ে আসে। আর প্রাণপণ শক্তিতে কান্না চাপতে গিয়ে হুহু করে কেঁদে ভাসাল সে।

—আরে, আরে, কাঁদছিস কেন ! কী বললাম তোকে !

—তুমি, তুমিও আমাকে তাড়াতে চাও দাদা। আমি কি তোমাদের এতই বোঝা হয়েছি···

—কী বোকা মেয়ে তুই! সৌরেশ পাত্র হিসেবে কি খারাপ?

লজ্জায়-সংকোচে যেন মাটির সঙ্গে মিশে যেতে চাইল সুলতা। দাদা তাহলে সব জেনে ফেলেছে। ফেলুক। সে ভয় পায় না। কিন্তু, আজ পর্যন্ত সৌরেশ বিয়ের প্রস্তাব তুলছে না কেন! আর কত পরীক্ষা করবে সে। আর কত ধৈর্যের পাথরে তার দেহের কামনাকে সে বাঁধ দিয়ে রুখবে!

—না, না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি। ওকে তুমি একটা কথাও বলতে পারবে না।

—কেন? তোদের ভালোমন্দ আমি বুঝব না?

—না দাদা। ভালো হক মন্দ হক এটা আমি—আমরাই সৃষ্টি করেছি। এর দায়িত্ব আমাদের।

সুলতার মুখের দিকে চেয়ে আবার অবাক হয় তিমির। এত বিশ্বাস, এমন স্বাভাবিক দৃঢ়তার সঙ্গে জীবন সম্পর্কে ভাবতে শেখাল কে ওকে! ও বই পড়েনি, মনীষার মতো কলেজে পড়েনি, তিমিবের মতো ইতিহাসের জ্ঞানও সে রাখে না, তবু জীবনের শাদামাটা সত্যকে এমন নিরাভরণ ভাবে চিনল কি করে!

—দাদা, খাবে না?

—চল্‌···

আবার রাত্রি, আবার দিন।

কিন্তু, একী প্রাণহীন জীবনধারণ, উৎসাহহীন বেঁচে থাকা। তিমির হাঁপিয়ে উঠল। একটা প্রকাণ্ড বোবা পাথর যেন তার মনের স্রোতকে গতিহীন করে তুলেছে। এমন নিঃসহায়, এত বিপুল রিক্ততা তাকে এইভাবে কোনোদিন পীড়িত করে তোলেনি।

সকালের ডাকে চিঠি এল। জগদীশ লিখেছে: বহুদিন তোমার

খবর নেই। ভারি হাতটান পড়েছে ভাই, যদি এই সময়ে আমার টাকাগুলো দাও তাহলে···

টাকা টাকা টাকা! বৈশ্বানরের চিতা জ্বলছে দাউদাউ করে। আরো বলিদান চাই, আরো রক্ত মাংস প্রাণ। কিন্তু, টাকা! চিন্তাগুলো টাকার আকারে যেন ঝুলতে থাকে কসাইয়েব দোকানে ঝুলিয়ে রাখা গোস্তের মতো।

ভাবতে ভাবতে আপিসের সময় হল। সেই চিরপরিচিত আপিস-ঘর, টেবিল, ফাইল, ফাইলের স্তূপ, নোটশীট, 'ইংরেজী তুমি বেশ ভালোই লেখ', চেয়ারম্যান শিবপ্রসাদ—সৌম্য শান্ত, চওড়া কাঁধ, শক্ত কবজি, মনীষার বাবা। মনীষা, কেমন আছে। 'পৃথিবী গোল, আবার দেখা হবে। সেদিন, সেদিন আমায় চিনতে পাববে তো?' জানি না। কে বলেছে পৃথিবী গোল! উত্তরমেরু আব দক্ষিণমেরুকে তুমি একসঙ্গে মেলাতে পার, পার দিন আর বাত্রিকে এক সূত্রে গেঁথে ফেলতে!

—তিমিরবাবু····

—উঁ?

—শবীব খারাপ?

—না।

—আজ সন্ধ্যেয় আমাদের ওখানে আপনার নেমন্তন্ন···

তিমির বললে, কেন?

বিনয় হেসে বললে, কারণ বলতে পারব না। হোস্টেসকে জিগ্যেস করবেন। আপিস থেকে একসঙ্গে বেরব, কেমন?

—আচ্ছা—আচ্ছা।

টাকা, টাকা চাই! 'বহুদিন তোমার খবর নেই'—জগদীশ। জগদীশ বিনয় শিখেছে, বৈষ্ণবী বিনয়। অসি ছেড়ে বাঁশি। ডান হাতটা মেলে ধরল টেবিলের ওপর। করতলে অসংখ্য আঁকিবুকি। গ্রহনক্ষত্রের ষড়যন্ত্র। শনি কুপিত, বৃহস্পতি কি তুঙ্গে! ভাগ্য-

রেখায় এত কাটাকাটি কেন, শুক্রস্থানে কালো তিলটার আবির্ভাবেরও কি কারণ। কি রাশি তার? সিংহ? না, কন্যা, তুলা, মেষ না বৃশ্চিক! বৃশ্চিকই হবে বুঝি! এ-হপ্তা কেমন যাবে?

—কেরানীবাবু—ও কেরানীবাবু—

—কে? বনমালী!

—সাহেব ডাকছেন।

—যাই···

উঠল তিমির। সুইং ডোর ঠেলে ভেতরে ঢুকল সে।

—নমস্কার স্যার···

—বস।

টেবিল, ফাইলের স্তূপ, ব্লটিং প্যাড, প্যাডের গায়ে প্রাইভেট রিজার্ভ, এ্যাশট্রের গায়ে ধূমায়মান সিগারেট। শক্ত কবজি, চওড়া কাঁধ, কানের পাশে বকের পালকের মতো শাদা চুলের পালিশ, ভ্রূর দু-একটা চুলে পাক-ধরা, ঘড়ির টকটক, মাথার ওপরে জাতির জনক।

বাইরে আকাশে মেঘ করেছে। ঘরের ভেতরে গুমট গরম। কে জানে, আজ রাত্রে ঝড় উঠতে পারে।

এ্যাশট্রের গায়ে সিগারেটটা ছাই উদ্‌গিরণ করে ক্ষয় হচ্ছে। মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়ায় ধক করে জ্বলে-জ্বলে উঠছে আগুনের দীপ্তি। সিগারেটটা কি আরো জ্বলবে, আরো ছাই হবে, তারপর হাওয়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো ছাইগুলো উড়ে গিয়ে আকাশে মেঘ হবে, বৃষ্টি হবে!

আর-একটা সিগারেটে অগ্নি সংযোগ করলেন শিবপ্রসাদ।

—আজ রাত্রে ঝড় হতে পারে?

—আজ্ঞে···?

—বাড়ির খবর ভালো? তোমার বাবার অসুখ শুনেছিলাম··

—এখন ভালো আছেন।

—হুঁ···

তিমির চুপ।

শিবপ্রসাদ চেয়ারে হেলান দিয়ে বললেন, সেদিন প্যাকেটটা দিয়েছিলে মনীর হাতে!

—হ্যাঁ স্যার।

—ঝগড়া হল কেন?

—ঝগড়া!

হাসলেন শিবপ্রসাদ।—মনী আমাকে সবই বলেছে।

তিমির চুপ।

—মনীকে কালকেই পাঠিয়ে দিয়েছি চেঞ্জে। ইদানীং ওর মন-মেজাজ ভালো নেই। কার্শিয়াং-এ আমার এক বন্ধু আছে, তাদের ওখানেই থাকবে কিছুদিন।

তিমির চুপ।

—হ্যাঁ। এই যে—এই কাগজগুলো মনী তোমাকে দিয়েছে। নাও—কাজে লাগবে হয়তো। কাগজের প্যাকেটটা এগিয়ে দিলেন শিবপ্রসাদ।—তোমার ব্রাউনিঙ-এর কবিতা মনে আছে? আমরা বি. এ. পড়বার সময় পড়েছিলাম। 'Grow old along with me! the best is yet to be ··' আচ্ছা, এবার তুমি যেতে পার।

—নমস্কার স্যার···

—থ্যাঙ্ক ইউ, থ্যাঙ্ক ইউ ইয়ং ম্যান।

সারাক্ষণ আচ্ছন্নের মতো কাটল তিমিরের। কেমন বোকাটে অনুভূতি। মনীষা চলে গেছে চেঞ্জে। পৃথিবীতে এটা একটা বড় দুর্ঘটনা নয়, এর চেয়েও গভীর দুঃখ আছে। ভালোবাসা! মনীষা কি সত্যিই তাকে ভালবাসত, ভালোবাসবার কি বৈভব ছিল তার। তবু সে ছিল তার জীবনের আর-এক প্রতিপক্ষ। এক অসম্ভব মধুর স্বপ্ন। জীবনের চলার পথে ওর দিকে পিঠ করে রাখলেও ওর অস্তিত্বটা ছিল অলক্ষ্য, কিন্তু জীবন্ত। অন্যমনস্ক পথিকের পৃষ্ঠদেশ

যেমন করে সূর্য এসে ভরিয়ে দেয়। ওই অলক্ষ্য উপস্থিতি অচেতনভাবে কি করে মানুষকে প্রেরণা দেয়, জীবনের শীতল পাত্রে ঢেলে দেয় উগ্র রৌদ্রের বিচ্ছুরণ। ওটা মানুষের জীবনের এক কণ্ট্রাডিকশন।

মাতালের দুর্বিসহ প্রলাপের মতো কেটে চলল মুহূর্তগুলি। অসংযত অসংবৃত। কাজ করে চলে, হঠাৎ ঝলসে ওঠে মনীষার মুখচ্ছবি—ক্লিষ্ট করুণ। কি ভাবছে এখন মনীষা? কি আছে ওই কাগজের মোড়কে। স্মৃতি, স্মৃতির সোনার খাঁচা।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল এল। কাজ আর অকাজের চাপে নিজের অস্তিত্বও ভুলে গেছে তিমির।

বিনয় এসে ডাকল।—চলুন। যাবেন না?

—এ্যাঁ! পাঁচটা বেজে গেছে!

—হ্যাঁ।

—চলুন তাহলে।

আবার রাজপথ।

মানুষ, মানুষের মুখোশ আর মুখশ্রী।

দুজনে হেঁটে চলল।

পার্কে কৃষ্ণচূড়ার শাখায় বেলাশেষের রোদের সোনা, যুবতী মেয়ের কান্নার মতো চিকচিক করছে। হাওয়ার মর্মর। শুকনো লাল হয়ে যাওয়া ঘাসের জমি। কর্কশস্বরে একটি কাক ডেকে উঠল।

সন্ধ্যা নামল। বিকেলের অবসরে আকাশ থেকে গোমরামুখো মেঘগুলো অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। সন্ধ্যা নামতেই কোথা থেকে দ্বিগুণ সৈন্যসামন্ত নিয়ে তারা আকাশে শিবির রচনা করল। কামার-শালায় অগ্নি স্ফুলিঙ্গ সহযোগে অস্ত্রের পরীক্ষা শুরু হল। আর সেই রণোন্মাদ দেবতাদের ভয়ে মর্ত্যের গাছপালাগুলো চামর দোলাতে

লাগল, পবনদূত ক্ষণে ক্ষণে তাদের কানে কানে কি বলে গেল আর তাই শুনে গাছগুলো দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ল।

খাওয়াদাওয়া সারতে রাত্রি নামল।

বিয়ের রাত্রে-দেখা কমলা আর এই কমলায় আকাশ-পাতাল পার্থক্য। প্রথম বিবাহ রাত্রের উচ্ছাস আজ আর তার পোশাকে-আশাকে কি সহজ ব্যবহারে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেক স্থিতধি আর ঘরোয়া হয়েছে সে। আজ বোধহয় সে আপিসে যায়নি, গেলেও ফিরেছে তাড়াতাড়ি। গায়ে একটা শাদা জামা আর সস্তা তাঁতের কাপড় জড়িয়েছে কোমরে। সিঁথের সিঁদুর জ্বলজ্বল করছে, কপালে খয়েরী টিপটাও কম মানায়নি তাকে। একা হাতে পরিবেশন করেছে, খাইয়েছে যত্ন করে, যত না খেয়েছে তিমির, তার চেয়ে বেশি আবদার আর উপরোধে কান ভারি হয়েছে তার। দেড়খানি মাত্র ঘর। এক ঘরে কমলার মা আর ভাইবোন। অন্য ঘর ওদের, পার্টিশন করে রচনা করা হয়েছে আধখানা রান্নাঘর। অসুবিধা খুব, আস্তে কথা বললেও পাশের ঘরে মা আর ভাইবোনদের মধ্যে তার ঢেউ জাগতে বাধ্য।

বিনয় হেসে বললে, ঘর-বাহিব আমাদের সব সমান। খাওয়া-দাওয়াব পর কোনো কোনোদিন সামনেব খোলা মাঠটায় গিয়ে বসি। বাড়ির দম বন্ধ করা ইচ্ছাগুলো বাইরের হাওয়ায় মুক্ত করে দিই। রাত দশটা এগারোটার পরও চুপচাপ বসে থাকি মাঠে। বাড়ি ভাড়াব সমস্যা এইভাবে মেটাই।

তিমির হেসে বললে, দেখবেন কোনোদিন আবার পুলিশে ধরে না নিয়ে যায়।

—যাক না। হাজতে নির্জন রাত্রিবাসে তো অসুবিধা হবে না।

কমলা ছদ্ম রাগে চাপা গলায় ঝংকার দিয়ে উঠল।—চুপ কর। অসভ্য কোথাকার।

হেসে উঠল দুজনে।

হাসি থামিয়ে তিমির বললে, তাহলে তো খুব অসুবিধা হচ্ছে আপনাদের ?

—না। অসুবিধা হবে কেন। রাজার হালে আছি।

কথা বলতে বলতে রাত্রি হল। আর বেরবার মুখেই ঘোলাটে হয়ে এল আকাশ। কালো কজ্জল মেঘরাশি। ধুলো উড়ল উদ্দাম বাতাসে। কালবৈশাখীর নৃত্য শুরু হল তাথৈ তাথৈ। ঝড়ের সাঁই সাঁই চাবুকের কশাঘাত। হিংস্র থাবা মেরে বর্ষণ শুরু হল—পাহাড়ে বর্ষার মতো। কড় কড় মেঘের পশুরা দাঁত কড়মড় করে উঠল। আর সঙ্গে শিলাবৃষ্টির মুদ্গর।

—এই ঝড়জলের মধ্যে যাবেন কি করে ? কমলা বাধা দিয়েছিল।

তিমির শোনেনি।

মাঝ রাস্তায় আটকে গেল তিমির।

দোকানটার দোরগোড়ায় অপেক্ষা করতে করতে বিরক্তি ধরে গেল তার।

আকাশ ভেঙে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। যেন এক মহাপ্রলয়ের রাত্রি। পৃথিবীর ক্লেদ-ক্লান্তি দুঃখ শ্রান্তিকে মুছে নিয়ে যাবে। আবার এক নতুন দিন নতুন সূর্যোদয়ের কিরণে ঝলমল করে উঠবে। সেদিন মানুষের চেহারা কি হবে! মানুষ কি সেদিন পাখি হতে চাইবে, বায়ুসমুদ্র মন্থন করে মুক্ত ডানায় সে সাঁতার কাটবে, সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত বিচিত্র রঙ সে তার ডানায় মেখে নেবে। আবার নতুন গৌড়-বঙ্গের ইতিহাস শুরু হবে, ইংরেজাবাদ নয়, মালদহ। বিদেশী বণিকের কাছে সেদিনকার সেই বৃদ্ধা সমস্ত পারা কিনে নেবে, আর সেই পারা পুকুরের জলে ঢেলে আরো অনেক পারা-দীঘির সৃষ্টি করবে। শীতকালে মালার মতো দহগুলো যখন শুকিয়ে যাবে তখনো আগামী কালের মানুষ সে-কথা ভুলবে না যে মালা-দহ থেকেই আজকের মালদহ শহরের জন্ম।···আর তিমিরেরা আবার নতুন করে জন্ম নেবে—সেদিনও কমলা থাকবে বিনয় থাকবে, জগদীশ-সুষমা-

ললিতাও থাকবে, সুলতা জন্মাবে বোন হয়ে, তরুণ আত্মহত্যা করবে না, তপন একজোড়া জুতোর জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরবে না। আর মনীষা। মনীষা এখন কি করছে, কি ভাবছে। কার্শিয়াং-এ কি এখন বৃষ্টি হচ্ছে, অভ্রের গুঁড়োর মতো বৃষ্টি ঝরে পড়ছে, কাঁচের শার্সিতে বৃষ্টির নূপুরনিক্কণ, আর পাইন গাছের সোঁ সোঁ শব্দ।

না। বৃষ্টি ছাড়ার লক্ষণ নেই।

আর তিলমাত্র অপেক্ষা না করে হুড়মুড় করে দুর্যোগের মধ্যে নেমে পড়ল সে। যদিও এ-এক দুরন্ত খেপামি, তবু ভালো লাগছে এই পাগলামিকে প্রশ্রয় দিতে। বৃষ্টির ধারাপাতে স্নান করে দেহ-মনের অবসাদ যেন ধুয়ে যাচ্ছে। চুল ভিজল, জামা কাপড় জুতো। সপ্ সপ্ শব্দ তুলে এগিয়ে চলল তিমির।

চারদিক অন্ধকার। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের অনুগ্রহে পথ-চেনা।

বারান্দার জল ঠেলে দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল সে।

—লতা···লতা···

সোঁ সোঁ সোঁ সোঁ—হাওয়ার শব্দ।

দরজা খুলল তপন।

ঘরের ভাঙা ছাদ চুয়ে টপটপ করে জল পড়ছে ছেঁড়া ছাতার মতো। জলে ভেসে গেছে মেঝেটা। এই অস্বাভাবিক দুর্যোগে এখনো বাতি জ্বালানো হয়নি। বিশ্রী ভূতুড়ে ভূতুড়ে লাগছে বাড়িটা।

ঘরের ভেতরে রুগণ চণ্ডীচরণ শুয়ে-শুয়ে কাশছেন। কাশির ধমকে প্রতি সেকেণ্ডে আয়ু ক্ষয় হচ্ছে।

ওদিকে বারান্দার ওকোণ থেকে কিসের একটা আওয়াজ। কে কাতরাচ্ছে যেন। একটা বোবা জান্তব গোঙানি। নাকি, মনের ভুল।

অন্ধকার···জমাট অন্ধকার···

—কে? খোকা? চণ্ডীচরণের গলা।

—হ্যাঁ।

—একেবারে ভিজে গেছিস তো। জামা কাপড় ছাড়।

বাইরে প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির মাতলামি।

—তপু, মা কইরে?

তপন মৃদু গলায় বললে, ওই কোণের ঘরে। দাইমা এসেছে। আমাদের ভাই হবে…

অন্ধকারে ঠাণ্ডা হাতে কে একটা চড় বসিয়ে দিল তিমিরের গালে। চমকে উঠতে গিয়ে সংযত হয়ে গেল। ঠোঁটের আগায় কি একটা কুৎসিত ভাষা বেরিয়ে এসেছিল। ধপ করে ভিজে জামা কাপড়েই বসল বিছানার ওপর।

অন্ধকাব। বাইরে না মনে! আলো জ্বেলে কাজ নেই। আবো অন্ধকার—আবো অন্ধকার নেমে আসুক। লেপেপুঁছে একাকাব কবে দিক মানুষের সংজ্ঞা, তার বিবেক-বিচার। অন্ধকাবের কাছে মানুষেব অনেক ঋণ—স্বর্গেব দেনা কি শোধ হবে না! এই ঘনঘোর দুর্যোগেব মধ্যে দিয়ে একটা যুগ সমাপ্ত হক। মহাপ্লাবনে ভেসে যাক পৃথিবী —এই বুড়ো জবদগব পৃথিবীটা।

এই কি জীবন। কি হবে বেঁচে থেকে। পিতৃপিতামহেব এই ক্ষণিক যৌনলীলা মেটাতে গিয়ে আমাদেব যুগটাকে শহীদ হতে হবে। রাগে দুঃখে ঘৃণায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করে তিমিরের।

অন্ধকারে পাথরের মতো স্থির বসে রইল সে।

জীবন নয়, জীবনের ব্যভিচার।

—লতা—লতা—শুনছিস কোথায় গেলি তোরা? যন্ত্রণায় বিকৃতস্বরে চিৎকার করে উঠল তিমির।

তপন এসে বললে, কাকে ডাকছ দাদা। দিদি তো নেই। মা তোমাকে ডাকছেন—

—কেন—কেন? মার-খাওয়া জন্তুর মতো খিচিয়ে উঠল তিমির। অন্তর নিঙড়ানো কান্না গুমরে গুমরে উঠতে লাগল বুকের মধ্যে।

মার দরজার পিছনে এসে দাঁড়াল তিমির।

—কে? খোকা। সৌদামিনী ককিয়ে উঠলেন।

—হ্যাঁ আমি। কি বলছ? বিরক্ত গলা তিমিরের।

—শুনেছিস, পোড়ারমুখী মেয়েটা কি সর্বনাশ বাধিয়েছে। সৌদামিনী বলে চললেন, সৌরেশ ছোঁড়াটা যে এইভাবে একদিন পালাবে আমি আগেই জানতাম। এখন মুখপুড়ীকে নিয়ে কি করি। ওর পেটে যে....

—মা। গর্জন করে উঠল তিমির। ওর মাথার মধ্যে যেন বিস্ফোরণ শুরু হয়েছে। এত অন্ধকার কেন।

—লতা, লতা কোথায়?

—দেখ। কোথায় মুখ ঢেকে পড়ে রয়েছে। মরণও হয় না ছুঁড়িটার। এক সঙ্গে অনেকগুলো কথা মুখে জড়ো হয়ে এসেছিল। ছিটকে সরে এল তিমির।

তপন বললে, কাছে-পিঠে কোথাও দিদি নেই। সেই ঝড়ের মধ্যে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে...

সুলতা কি আত্মহত্যা করে বসল শেষে। তার সস্তা জীবনটা এইভাবে সস্তায় খুইয়ে বসল সে। কি আশ্চর্য এই জীবনের জটিলতা। জীবন...মৃত্যু....জীবন...মৃত্যু....জীবন...মৃত্যু। জীবনকে অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করেছিল সুলতা। ভালোবেসেছিল সৌরেশকে। ভাদ্রেব কানায় কানায় ভরতি নদীব মতো তার ভালোবাসা। তাই একদিন যখন থেমে পড়বার পালা এল দেখল আর কিছুই ফেরাবার জন্যে রাখেনি সে। নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে অনেকদূরে বইয়ে নিয়ে গেছে। সেখান থেকে আর ফেরবার উপায় নেই—হয় এগতে হবে, নইলে ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে হবে। সুলতা ভুল করেছে, কারণ ভুল করা তার পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক। জীবনে ভুল করে না কে। ভুল-কে ভুল ভেবেই তো আবার শক্ত সমর্থ হয়ে নতুন করে এগতে হবে, দেখতে হবে পৃথিবীটাকে।

বাইরে সমান তালে ঝড়বৃষ্টির মাতন।

ভিজে জামা কাপড়েই আবার বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ল তিমির।

সুলতাকে খুঁজে বার করতে হবে। যদি তার দেহে এখনো প্রাণ থাকে নষ্ট হতে দেবে না আবার ওকে বাঁচতে হবে, জানতে হবে, শিখতে হবে।

অন্ধকার।

রাস্তায় জনপ্রাণী নেই।

অন্ধকার ঠেলে এগিয়ে চলল তিমির। সুলতার জন্য সমস্ত পৃথিবীটাই তোলপাড় করে বেড়াবে।

—লতা···লতা···উন্মাদের মতো টলতে টলতে এগিয়ে চলল সে।

সামনে মহানন্দা। ঘন বর্ষণের আদরে ফুলে ফেঁপে উঠেছে। আত্মহত্যার পক্ষে এমন পরিবেশ আর নেই। ধীরে ধীরে নেমে যাও মহানন্দার বুকে—স্রোত আর গভীরতা পাকে পাকে জড়িয়ে ধরবে মৃত্যু-উন্মুখকে।

পাড়ের আমগাছগুলো দৈত্যের মতো অশান্ত বায়ুভরে শাখা দুলিয়ে কাঁপছে। নির্জন নদীতীর। পিছল, কর্দমাক্ত।

—লতা···সু-ল-তা · আবার চিৎকার করে উঠল তিমির।

ঢালু খাড়া পাড় ছাড়িয়ে নদীর কিনারে এসে দাঁড়াল সে।

মাথার ওপরে বিদ্যুতের ঝলসানি। আর বজ্র নির্ঘোষ।

আবার তীব্র বিদ্যুতের ঝলক। একটা ক্রুদ্ধ সাপ যেন আকাশের বুকে এঁকেবেঁকে ছুটে গেল।

জেলেদের সারি সারি বাঁধা নৌকো। ছলাৎ ছলাৎ শব্দ।

আবার বিদ্যুৎ চমকাল।

ধোপাদের কাপড়-কাচা কাঠের তক্তা। তার কাছাকাছি শাদাটে কি একটা দেখা যাচ্ছে। নড়ছে। মানুষের মূর্তি বলেই মনে হচ্ছে

—লতা···সু-ল-তা···আবার ডাকল তিমির।

কোনো প্রতিধ্বনি নেই।

এক-পা এক-পা করে ওদিকে এগিয়ে গেল তিমির।

—সুলতা!

ফ্যালফ্যাল করে দাদার দিকে ধূসর চোখে তাকিয়ে থাকে সুলতা। জলে বৃষ্টিতে ভিজে শরীর কাঁপছে থরথর করে।

—দাদা—দাদাগো···

তিমিরের বুকে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সুলতা।

ওকে প্রবোধ দেবার ভাষা খুঁজে পেল না তিমির। শুধু বললে, আয় আমার সঙ্গে—

—কোথায়? আমি কোথায় যাব দাদা?

—চল্—ফিরে চল্—

—না। আমি বাড়ি যাব না দাদা।

—পাগল কোথাকার। এইভাবে মরবি? তোকে বাঁচতে হবে। আয় আমার সঙ্গে। দেখ্, আমার দিকে চেয়ে দেখ্, আমি তোর দাদা। আমি বলছি তোকে বাঁচতে হবে বোন। পৃথিবীটা অনেক বড়, সেখানে আমার যদি জায়গা হতে পারে তোর জায়গার এতটুকু অভাব হবে না।

প্রলয়-পাগল রাত্রির অন্ধকারকে চিরে হাতে হাত ধরে ছুটে চলল দুজনে।

তিমিরের মস্তিষ্ক রাত্রির গর্ভ থেকে ইতিহাসের ভ্রূণকে ছিঁড়েখুড়ে বার করবার চেষ্টা করছে। এই প্রলয় শেষে নবজাতক ভবিষ্যের জন্ম হবে, কিন্তু কই তার জীবন যন্ত্রণার মর্মস্পর্শী ক্রন্দন, তার বিপুল চিৎকারে তো কেঁপে কেঁপে উঠছে না রাত্রির যবনিকা। এ কেমন ভবিষ্যৎ, নবজন্মের সঙ্গে নতুন কি অঙ্গীকার ঠোঁটে করে আনল সে অনাগতের জন্যে। মৃত পাণ্ডুর ভবিষ্যৎ। যেন এক শবযাত্রা থেকে আর এক শবযাত্রার আয়োজন।

কান্নায় গুমরে উঠল তিমির। এ-কান্না জন্ম থেকে জন্মান্তরের, যুগ থেকে যুগান্তরের। নগ্ন নির্জন অনাথ মানবকের।

ইতিহাসের ধারা বয়ে চলেছে আপন খাতে। এই ধারার বাহক নয় তিমিরেরা। ইতিহাস শুধু গর্ভ থেকে গর্ভান্তরে বিগ্রহ বদল করেছে, এ-বিগ্রহ সচল জীবন-প্রবাহ, টলস্টয়ের মুভিং ফোর্স। যুগে যুগে ইতিহাসের নায়ক এরাই। গৌড়বঙ্গের ইতিহাস রক্তক্ষয়ী সিংহাসন দখলের বিবৃতি নয়, যারা ইটের পর ইট সাজিয়ে পাথরের পর পাথর দাঁড় করিয়ে গৌড়নগরী পত্তন করেছে, যারা রাজরোষে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে, ম্যালেরিয়া-ওলাউঠা-কালাজ্বরে প্রায় নিশ্চিহ্ন। দুর্বিসহ মহামারীর প্রকোপ থেকে যেদিন ভীত চকিত নামহীন গোত্রহীন মানুষ পালিয়েছে দূরে, দূরান্তরে—সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসকেও তারা কাঁধে করে নিয়ে এসেছে, গড়েছে মালদহ, সাহাপুর, মকদমপুর, আর কুতুবপুর। আর ইতিহাসের জীবন্ত বিগ্রহকে হারিয়ে গৌড় অকাল বার্ধক্যে পঙ্গু হয়ে ফেলেছে তার অন্তিম নিশ্বাস।

গড়ে উঠল নতুন শহর মালদা। গৌড়ের নবাবের ত্রাসে পলায়িত শিল্পী আবার রচনা করেছে তার রেশম কাঁথার নকশা। তার নামকীর্তন, তার গম্ভীরা। ইতিহাস এদের চক্র করেই আবর্তিত হয়েছে। এরও পর এসেছে ডাচ্-ওলন্দাজ-ইংরাজ। মালদহ নামান্তর গ্রহণ করেছে আংরেজাবাদে। ইতিহাসের চাকাকে আটকাতে গিয়ে তারাই একদা চাকার তলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে পথের ধূলিকণা হয়েছে। ইতিহাস শুধু মানুষের, চলমান জীবন প্রবাহের।

জনসাধারণই ইতিহাসকে এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এই নামহীন গোত্রহীন জনসাধারণকে চেনে না তিমির, জানে না তার স্বরূপ। ইতিহাসের রঙ্গমঞ্চে ওদের শুধু মৃত সৈনিকের ভূমিকা। আরো দিন কাটবে, ইতিহাস আরো অভিজ্ঞ, আরো বিজ্ঞ হবে। কিন্তু ইতিহাসের পাদপীঠে তাদের কোনো স্বাক্ষর থাকবে না। বুদ্‌বুদের মতো ভেসে

উঠে তাদের অস্তিত্বের মূল্য অনন্ত অপার ইতিহাস-সায়রে নিঃশেষে মিশে যাবে।

যাক। ইতিহাসের অমরতার ভান নিয়ে কেউ জন্মায়নি। তাদের জীবনের মড়া হাড়ের ওপর দিয়ে আবার ইতিহাসের অভিযান চলবে, পরিত্যক্ত গৌড়ের মতো, তাদের পাশ কাটিয়ে ইতিহাস যদি অন্য কোথাও তার অধ্যায় সৃষ্টি করে, করুক। সেদিনকার কুতূহলী নরনারী প্রত্নতাত্ত্বিক এষণা নিয়ে প্রাচীন যুগের ব্যর্থতার স্বাক্ষর ভাঙা স্তূপের মধ্যে খুঁজে বার করবে।

বিশ শতকের মধ্যযামকে আগামী শতাব্দীর প্রত্যূষে মিলিয়ে দেবার জন্যে সহজ পায়ে এগিয়ে গেল ওরা॥